রবিকুমার সান্যাল

তরঙ্গ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৫২

দাম—২॥০ টাকা

১২নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

হিন্দুস্থান বুকডিপো হইতে

প্রকাশিত

৬০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

আসাম বেঙ্গল প্রেস হইতে

মুদ্রিত।

তরঙ্গ

... রাতে ট্রেন বদল করা একটু কষ্টকর বৈ কি। ... একটা তোরঙ্গ, দুটো স্যুটকেশ, রাশি পরিমাণ বিছানা ...টা দুই লণ্ঠন, টিফিন্ ক্যারিয়র, জলদানি, দুধের বোতল —কি নেই? ঘুম-চোখে ছেলেমেয়ে তিনটের নড়া ধ'রে ...না; তার ওপর কাতিক মাসের নতুন হিম; ...দেশ-বিভুঁই পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লে বেড়ানোর অনেক ...লা।

—রোসো, দস্যিগিরি ক'রো না, গাড়ী আগে থামুক। ...মা, বাইরে যে কিছু দেখা যায় না,—একে রাত, ...'তে আবার অত কুয়াসা,—আলোগুলোও বুজে গেছে। ...র অত বাঁধাবাঁধি করতে হবে না, যা হোক ক'রে দড়ি ...য়ে বিছানাটা জড়িয়ে নাও। হ্যাঁ গা, কুলি-টুলি এদিকে

পাওয়া যাবে ত ?—আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে শৈলবালা স্বামীর দিকে তাকালো।

ভূপতি বললে, জল হাওয়ার গুণে তোমার শ্রীঅঙ্গে ত বেশ পোষ্টাই হয়েছে, কুলির খরচটা বাঁচিয়ে দাও না ?

শৈলবালা হাসিমুখে বললে, তোমার এই পাঁচ মণ লগেজ বুঝি আমাকে দিয়ে—

ক্ষতি কি ?—ভূপতি বললে, বাঙ্গলা দেশের মেয়ে পশ্চিমে গিয়ে পুরুষ হয়ে আসে। তুমি আর এইটু পারবে না ? আচ্ছা, আমি না হয় একটু সাহায্য করব।

তুমি ?—শৈলবালা বললে, তোমার না জ্বরভাব ? যদি ভালো চাও র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নামো। মিণ্টুর হাত ধ'রো, বেণু নিজেই নামতে পারবে,—অজুকে দাও আমার কোলে। আঃ দাঁড়াও, গাড়ীখানা একদম থামুক আগে। হ্যাঁগা, রাত কত ?

বারোটা বাজে।

আমাদের গাড়ী আবার কখন্ আসবে ?

প্রায় আড়াইটে।

শৈলবালা বললে, বাবা ! ভয় করে ! যদি জ্বরের ওপর ঠাণ্ডা লাগে তোমার ? এখানে ওয়েটিং রুম আছে ত ?

ভূপতি বললে, পতিভক্তিতে অন্ধ ! কোথাও দেখে যে ওয়েটিং রুম্ নেই ?

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামলো। অত রাতেও যাত্রী, কুলি অথবা ফেরিওয়ালা—কারোই অভাব নেই। গাড়ী থামতেই তিন-চারজন কুলি এসে দরজা অবরোধ করলে। শৈলবালা বললে, থামো, ও সব হবে না। কম্ফার্টার হাতে নিয়ে আছি, এসো আগে গলায় জড়িয়ে দিই।

কৌতূহলী লোকচক্ষুর সামনে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করার ধৈর্য ভূপতির নেই। সে কাছে এগিয়ে এলো, শৈলবালা তার দুই কান ঢেকে গলায় কম্ফার্টার বেঁধে দিলে। বললে, চলো. ওয়েটিং রুমে গিয়ে আগে একটু দুধ গরম ক'রে দেবো।

যথা আজ্ঞা দেবী,—কেবল প্রাণে মেরো না।

জবরদস্ত মেয়ে সন্দেহ নেই। কোলের ছেলেটাকে কাঁকালে নিলে, একটার হাত ধরলে, এক চোখ রাখলে স্বামীর প্রতি, অন্য চোখ লগেজের সংখ্যার দিকে,—তারপর উপস্থিত জনতার পরোয়া না ক'রে মহা সোরগোল তুলে সে গাড়ী থেকে নামলো। বড় মেয়ে বেণুর হাত ধ'রে ভূপতি নেমে এলো। দুজন কুলি জিনিসপত্র মাথায় তুললে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাটাতে হবে, দীর্ঘকাল, সুতরাং বেশ গুছিয়ে বসার মতো জায়গা পাওয়া দরকার। শৈলবালা বললে, মেয়েদের ওয়েটিং রুমে আমি থাকতে পারব না, তোমাকে দেখবে কে? চলো পুরুষদের ঘরে—ছেলেমেয়ে তিনটের আগে বিছানা ক'রে দিই।

ভারি ঠাণ্ডা, চলো চলো—এই কুলি, এধারে আও, কই গো, কোথায়? কোন্‌দিকে?

ভূপতি বললে, এই যে, এখানে। এঃ' ভারি ব্যস্ত মানুষ তুমি, একটু সবুর সয় না!

সবুর সইবে বৈ কি, রোগা মানুষ, না তুমি? ভালোয়-ভালোয় এখন দেশে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। এই কুলি, এধার আনো জিনিষপত্তর,—ভিতর্ আন্‌কে রাখো—

ভূপতি বললে,—হয়েছে থামো। তোমার অত্যাচার সয়, হিন্দিবুলি অসহ্য।

গলা নামিয়ে শৈলবালা বললে, ওগো, ছাখো ত' কে লোকটা সেই থেকে এখানে ঘোরাফেরা করছে?

মুখ বাড়িয়ে দেখে ভূপতি বললে, ও কিছু না। এক গা গয়না, এক গা রূপ,—লোকের আর অপরাধ কি!

শৈলবালা বললে, আ মরণ। ও কি কথার ছিরি! গভীর রাত, ভয় করে তাই বলছি।

তোমাকে দেখে ডাকাতরাও ভয়ে পালাবে।

কেন শুনি?

সোনার খোঁচাতেই ত' বেচারিদের রক্তপাত হবে।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে কুলিরা জিনিসপত্র নামিয়ে রাখলো। ভূপতি বললে, আড়াইটের এক্‌স্‌প্রেসে আমরা কলকাতা যাবো, সেই গাড়ীতে তুলে দিয়ে তোমরা পয়সা নিয়ো, বুঝলে?

কুলি দুজন রাজি হ'য়ে চলে গেল। তারা যাবার পর মেঝেয় বিছানা পেতে শৈলবালা ছেলেমেয়ে শুইয়ে দিল। বড় বেঞ্চখানার উপর স্বামীর জন্য শতরঞ্চি ও কম্বল পাতলে, তারপর সন্তান ও স্বামীর মাঝামাঝি মেঝেটুকুতে নিজের জন্য একটুখানি জায়গা ক'রে নিল। ভূপতি বললে, আমি কিন্তু একটু ঘুমিয়ে নেবো, তা তোমাদের কপালে যাই থাক্‌।

শৈলবালা বললে, আগে একটু দুধ গরম ক'রে দিই, খেয়ে ঘুমোও।

আর তুমি?

আমি জেগে থাকবো। দুদিন ধ'রে খাতায় জমা-খরচ তোলা হয়নি, বরং সেইটুকু সেরে ফেলি। দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা বৈ ত' নয়।

হা বিধাতঃ!

ষ্টোভটা বে'র ক'রে জ্বাল্‌তে গিয়ে শৈলবালার সহসা দরজার দিকে চোখ পড়লো। বাইরে রাত গভীর হ'লেও ষ্টেশন একেবারে নির্জন নয়, মাঝে মাঝে লোকজনের আনাগোনা আর কোলাহল, কখনও ফেরিওয়ালার কণ্ঠ, কখনও বা শান্টিং গাড়ীর হাঁসফাঁশানি। দরজাটা তারের জাল দিয়ে তৈরী, সেই দিকে ঠাউরে একবার লক্ষ্য করেই শৈলবালা ভয়ে আঁৎকে উঠলো। ভয়ার্ত চাপা কণ্ঠে উত্তেজিত হয়ে বললে, ওগো, ওঠো দিকি একবার!

ভূপতি আরাম কেদারায় সোজা হ'য়ে বসলো। বললে, কেন? কি?

সেই লোকটা। একবার ছাখো ত বেরিয়ে, সেই লোকটা ছাড়া আর কেউ নয়। সেই যে ঘুরছিল আশপাশে?—এই ব'লে শৈলবালা গায়ের গয়নায় চাদর ঢাকা দিয়ে ষ্টোভ ছেড়ে ঘরের এক কোনে গিয়ে দাঁড়ালো। খবরের কাগজে ট্রেন-ডাকাতির সংবাদটা এখনও তার মনে রয়েছে।

ভূপতি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো। শৈলর কথা মিথ্যা নয়, আলোক আর অন্ধকারের ছায়ায় মাথায় টুপিপরা একটি যুবক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে দুপা এগিয়ে এল।

ভূপতি প্রশ্ন করলে, কি চান্?

মাথায় টুপি থাকলেও পরণে বাঙ্গালীর পোষাক। যুবক হাসিমুখে বললে, চাইনে কিছু,শুধু দেখছি আপনাদের অনেকক্ষণ থেকে।

কেন বলুন ত? কে আপনি?

চিনতে পারবেন কি আমাকে? আমার নাম নিরঞ্জন চাটুজ্যে। পারলেন না ত' চিনতে?

ভূপতিকে স্বীকার করতেই হোলো, অচেনা মানুষ। কিন্তু পরে বললে, আমাকে কি চেনেন আপনি?

নিরঞ্জন বললে, ক্ষমা করবেন, আপনার স্ত্রীকেই চিনি

আমার স্ত্রীকে? মানে, যিনি আমার সঙ্গে, এই ঘরে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিচিত্র বটে। আপনি কে বলুন ত ?

নিরঞ্জন হাসলো। বললে, আপনার স্ত্রীর নাম কি শৈলবালা দেবী ? একবার ডাকুন না তাঁকে ?

ভূপতি একবার আপাদমস্তক তার দিকে তাকালো। বললে, ভারি জটিল মনে হচ্ছে। আপনি কি তাঁর কোনো আত্মীয় ?

অনেকটা।

মানে ?

মানে, শাস্ত্রসম্মত নয়, তবে গ্রাম সম্পর্কে—

ভূপতি বললে, তিনি ত গ্রামের মেয়ে নন্ ?

নিরঞ্জন সবিনয়ে বললে, কল্‌কাতা শহরের একটা অংশের নাম ছিল আগে গোবিন্দপুর গ্রাম। ভয় কি, একবার ডাকুন তাঁকে, আমি চোর ডাকাত নই, গান্ধীজির চেলা।

ভূপতিও এবার হাসলো। বললে, তা'তেও বিশেষ ভয় কমলো না।—এই ব'লে সে দু'পা ভিতরে গিয়ে ডাকলো, ওগো, এসো ত' একবার এদিকে ?

শৈলবালা কিছু বুঝতে না পেরে ইঙ্গিতে বললে, আমাকে কেন ? আমি যাবো না।

আরে, এসো এসো, উনি একজন অহিংস ব্যক্তি মনে হচ্ছে। গ্রাম-সম্পর্কে সম্পর্ক কী তা এখনও জানতে পারিনি বটে, তবে আশা করি বিপজ্জনক নয়।

নিরঞ্জন বললে, চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে। আচ্ছা, আমিই ভেতরে যাই।

ভিতরে এসে নিরঞ্জন টুপিটা খুলে ফেললে। ঘরের আলোটা ঘন, উজ্জ্বল—ছায়া, আবরণ কোথাও কিছু নেই। শৈলবালার মাথায় ঘোমটা টানা ছিল, এবার অবাক হয়ে ঘোমটা একেবারেই সরিয়ে দিল। হাসিমুখে বললে, ওমা……তুমি?

নিরঞ্জন বললে, কে আমি বলো ত?

তুমি ত' সেই আমাদের শ্রীকান্ত!

ভূপতি সবিস্ময়ে বললে, শ্রীকান্ত?

হ্যাঁ গো, ওর নাম অবশ্য নিরঞ্জন। ছোটবেলা একটু হাবাগোবা ছিল কিনা তাই আমরা বলতুম, শ্রীকান্ত। তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?—এই ব'লে হাসিমুখে শৈলবালা কাছে এসে দাঁড়ালো।—আর যে তোমাকে চেনাই যায় না। সেই ডিগডিগে ছেলে, পেটরোগা, এখন একেবারে কী লম্বা-চওড়া! এত রং ফর্সা হোলো কেমন ক'রে, শ্রীকান্ত?

নিরঞ্জন বললে, শ্রীকান্ত ব'লে ডাকলে কোনো কথার জবাব দেবো না।

তিন জোড়া চোখ তিনজনের প্রতি আবর্তিত হ'য়ে ঘরে তুমুল হাসির রোল তুললো।

শৈলবালাই আবার কথা আরম্ভ করলো। বললে, ওগো, তুমি বোধ হয় চিনতে পারবে না, সেই আমার

বিয়ের দিন রাত্রে তুমি ওকে দেখেছিলে, সে আজ প্রায় এগারো বছর হোলো। আমাদের মণিমাসিমার ছেলে, আমাদের বাড়ীতে ভাড়াটে ছিল ওরা। মণিমাসিমা কোথায় এখন?

নিরঞ্জন বললে, লক্ষ্ণৌতে, কাকার ওখানে।

তোমার বোনরা কোথায়? অণিমার বিয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ, তারা সব শ্বশুরবাড়ী।

ওঃ কদ্দিনের কথা। তুমি বিয়ে করেছ, নিরঞ্জন?

একটু খতিয়ে নিরঞ্জন বললে, করেছি।

বউ কোথায়? ছেলেপুলে হয়েছে?

হ্যাঁ, একটি ছেলে। ওরা পাশের ঘরে রয়েছে।

শৈলবালা সানন্দে বললে, পাশের ঘরে? দাঁড়াও, আমি দেখতে যাবো। আমরা ভাই পশ্চিমে গিয়েছিলুম বেড়াতে, এখন ফিরছি। এখানে গাড়ী বদল করব। ওঁর শরীর ভালো থাকলে আরো দুচার দিন বাইরে থাকতুম।

ভূপতি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। নিরঞ্জন বললে, এবার আপনার নাম মনে পড়েছে,—ভূপতি মুখোপাধ্যায়! আপনার শুভদৃষ্টির সময় আমি কনের পিঁড়ি ধরেছিলুম, বরযাত্রীদের পরিবেষণ আমার হাতেই হয়েছিল মনে রাখবেন।

ভূপতি হাসিমুখে বললে, গ্রাম সম্পর্কে যিনি আমার শালা তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

শৈলবালা বললে, শেষের কথাটা বলতে বুঝি লজ্জা

পাচ্ছ, নিরঞ্জন? বর-বিদায়ের দিনে ছেলের কী কান্না! আমরা দুজন ছিলুম এক বয়সী। কেউ ওকে শান্ত করতে পারে না, আমার আঁচল ছাড়ে না, বলে, তোমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাবো। আমি একটা আংটী উপহার দিলুম, সেটা কাঁদতে কাঁদতে ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। সেই পাগলামি মনে পড়ে, নিরঞ্জন?

নিরঞ্জন বললে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তুমি একটিও চিঠি দিলে না তা'তেই ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেল। আমরাও বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলুম।

ভূপতি চোখ বুজে হেসে বললে, আমিও বাঁচলুম!

একবার হেসে শৈলবালা বললে, দাড়াও ভাই, ওঁকে একটু দুধ গরম ক'রে দিয়ে তোমার বউকে দেখতে যাবো। —এই ব'লে সে ষ্টোভ জালতে বসলো। বোতলের দুধ বাটিতে ঢেলে ষ্টোভের উপর বসিয়ে পুনরায় বললে, ছেলেটি তোমার কত বড় হয়েছে, নিরঞ্জন?

বছর খানেকের হোলো বৈ কি।

বউ সুন্দর হয়েছে ত?

নিরঞ্জন মুখ টিপে বললে, বউ মাত্রেই সুন্দর।

ওরে বাবা, এত?

ভূপতি টিপ্পনি দিয়ে বললে, নিজের দেখে বুঝতে পারোনা?

শৈলবালা বললে, থামো। ভারি বেহায়া তুমি। আচ্ছা নিরঞ্জন, বউ তোমাকে ভালোবাসে খুব?

ভূপতিই আবার উত্তর দিল,—সন্তানাদির পর এ-প্রশ্নটা বাতিল হয়ে যায়।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে শৈলবালা বললে, আচ্ছা, তোমার বউকেই জিজ্ঞেস করব গিয়ে, কি বলো ভাই?

নিরঞ্জন বললে, পোষ মেনেছে কিনা তাই জিজ্ঞেস ক'রো। তোমার বুঝি এই তিনটি ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ, মেয়েটি বড়। আর কি, পাঁচ সাত বছরের মধ্যেই কন্যেদায়। দেখতে দেখতে বয়স কি আমাদের কম হোলো ভাই?

ভালোই ত', বিয়ের কনে থেকে দিদিমা, একেবারে সোজা রাস্তা।

ভূপতি বললে, আপনারা কদ্দুর যাবেন, নিরঞ্জন বাবু?

বাবু আর বলতে হবে না ওকে, নাম ধ'রে ডাকো। চোখে ভাসছে সব। সেই হ্যাংলা ছেলে, সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ায়,—আর, দস্যি আমাদের ঘরে ঢুকে সব পুতুল ভেঙে দিত। কী মার খেয়েছি আমরা ওর হাতে। বোনেদের বাক্সে পয়সা রাখার জো ছিল না। নিরঞ্জন, মনে পড়ে সে সব দৌরাত্ম্যি?

নিরঞ্জন হাসিমুখে বললে, না।

না? দুষ্টু কোথাকার! ওগো শোনো, ওর বোনরা আর আমি একদিন ঘুমিয়ে আছি ঘরে, ও করলে কি, চুপি চুপি ঘরে ঢুকে কাঁচি দিয়ে আমাদের মাথার চুল কেটে

নিলে। কী সাধের চুল আমাদের। আমরা কেঁদে কেটে খাইনি দুদিন। মনে পড়ে না?

না।

আচ্ছা, চলো তোমার বউয়ের কাছে, মনে করিয়ে দেবো সব। ওগো, রাত কত দেখো ত?

নিরঞ্জন হাত ঘড়ি দেখে বললে, প্রায় একটা বাজে। তোমাদের গাড়ী বোধ হয় আড়াইটেয়। আমাদের লক্ষ্ণৌর গাড়ী সেই তিনটের সময়।

শৈলবালা বললে, এবার কল্‌কাতা ফিরে আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যাবে ত? বউকে নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।

নিরঞ্জন বললে, আচ্ছা।

ষ্টোভ থেকে বাটিটা নামিয়ে পেয়ালা ভ'রে শৈলবালা স্বামীকে গরম দুধ দিল। তারপর উনুনটা নিভিয়ে সে উঠে দাড়িয়ে বললে, বউ তোমার পাশের ঘরে? ওগো, দুধটুকু খেয়ে তুমি একটু ঘুমোও, আমি ঠিক সময় এসে ডাকবো।

ভূপতি বললে, ঘরটায় ভারি আরাম, সারারাত না ডাকলেও দুঃখিত হবো না।

নিরঞ্জন বললে, আপনিও আসুন না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

ভূপতি হাসিমুখে বললে, আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন আমার বাড়ীতে তার নিমন্ত্রণ

রইলো। আজ থাক্, এরা ঘুমিয়ে রয়েছে,—বেশ ত', কল্‌কাতায় গিয়েই আলাপ পরিচয় হবে।

শৈলবালা দুপা এগিয়ে আবার ফিরে এলো। তারপর কাশ্মীরি শালখানা স্বামীর পা থেকে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে দিয়ে চুপি চুপি বললে, দেখো, খুলে ফেলো না যেন, মাথার দিব্যি।—বউটাকে যদি ভালো না লাগে এক্ষুনি চ'লে আসবো।—এই ব'লে সে নিরঞ্জনের পিছনে পিছনে ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো।

ভিতরের আলোয়, আলাপে আর আরামে বাইরের কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না। হেমন্তরাত্রির অন্ধকারে প্লাটফরমটা ছাড়িয়ে দূরদূরান্তর অবধি ঘনকুয়াসায় আচ্ছন্ন। জনবিরল ষ্টেশনের চারিদিকে রাত সাঁ সাঁ করছে। আলোয় ছায়ায় বিদেশের অজানা চেহারাটা কেমন যেন অস্পষ্ট রহস্যে ভরা। মানুষের সমাগম রয়েছে বটে কিন্তু ছায়াচারীদের নির্ভুল চেনা যায় না। কে আসে, কে যায়, কোথা দিয়ে কারা চলে কোন্ দিকে,—যেন সব মিলিয়ে একটি অবাস্তব ঘুমজড়ানো মনের কল্পনা। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় শৈলবালার মুখের উপর তৃপ্তির আবেশ বুলিয়ে দিলে। সে যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

কিছুদূর গিয়ে শৈলবালা বললে, কই শ্রীকান্ত, পাশের ঘরে বললে যে? এতদূরে এলুম কেন? বউ কোথায় তোমার?

তার হাসিমুখের দিকে চেয়ে নিরঞ্জনের মনটা খুশিতে ভ'রে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে বললে, অপরাধ নিয়ো না শৈল, একটি কথা বলি। মনে করো আমরা সেই আগেকার মতনই আছি।

মুখ ফিরিয়ে শৈলবালা বললে, বলো না কী বল্‌ছ?

বিয়ে আমি করিনি।—নিরঞ্জন নিবেদন করলো।

সবিস্ময়ে শৈলবালা তার প্রতি তাকালো। বললে, ওমা, সে কি? বউ দেখাবে ব'লে যে নিয়ে এলে? উনি কি মনে করবেন বলো ত! বিয়ে করোনি?

না। বলছিলুম কি, তুমি একটু পরেই চ'লে যেয়ো কেমন?

শৈলবালা বললে, তা না হয় যাবো, কিন্তু তুমি মিছে কথা বললে কেন? এতকাল পরে দেখা—

নিরঞ্জন বললে, বিয়ে হয়নি এ কথাটা বলতে একটু লজ্জা করে।

কি করছ আজকাল?

কল্‌কাতায় নতুন প্রফেসারি নিয়েছি। এতদিন পরে তোমাকে দেখে তখন থেকে কী যে ভালো লাগছে।

তাই বুঝি প্রথমেই আমাকে ধাপ্পা দিলে?—হাসিমুখে শৈলবালা একবার পিছন ফিরে তাকালো তারপর পুনরায়

বললে, উনি যদি বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে ? আর একটু এগিয়ে চলো। কী দুষ্টু তুমি ?

নিরঞ্জন বললে, দুষ্টু কেন হবো ? আমি ত' এখন আর তোমার পুতুল ভাঙবো না ?

চলতে চলতে শৈলবালা বললে, আমাকে বিপদে ফেললে ত ? উনি যদি জানতে পারেন, তোমার বউ নেই,—আর দুজনে কেবল বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, ওঁর মনে কী হবে বলো ত ?

হঠাৎ যে দেখা হবে তোমার সঙ্গে, ভাবিনি—নিরঞ্জন বলতে লাগলো, মাত্র এগারো বছর, কালকের কথা। মানুষ স্বপ্ন দেখে একটি মুহূর্তের মস্তিষ্ক বিকলনে, কিন্তু তারই মধ্যে যেন থাকে যুগান্তকালের কাহিনী।

অদ্ভুত ছেলে তুমি। কী ক'রে চিনলে আমাকে এত ভিড়ের মধ্যে ? ভাবছিলুম কে একটা লোক আমাকে লক্ষ্য করছে বার বার! তুমি যে সেই ডাকাত কে জানে।—শৈলবালা বললে, সত্যিই স্বপ্নের মতন লাগে। বাবা, কী কান্না তোমার, আমিও কেঁদে বাঁচিনে। ছোট-বেলাকার ভালোবাসা কিনা, কাঁদায় বেশি। এখন যে কে কোথায় এসে পড়েছি বুঝতেই পারিনে। তোমার চেহারা দেখে প্রথমটা আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কি দেখ্‌ছ বলো ত ?

নিরঞ্জন একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে বললে, দেখছি তোমাকে।

কী দেখ্‌ছ ?

তোমার তেমনি কটা চোখ, একটুও রং বদলায়নি।

শৈলবালা হেসে বললে, তুমি ত' বলতে পানা-পুকুরের জল।

হ্যাঁ, চেহারাটাও একই রকমের আছে।

দূর পাগল। তিন তিনটে ছেলেপুলে, তা জানো? চলো না, ওদিকে একটু যাই।

নিরঞ্জন বললে, হোঁচট লাগবে না ত? ভারি অন্ধকার।

শৈলবালা বললে, তা হোক। বেশ লাগছে ঠাণ্ডায় হাঁটতে। বিয়ে না ক'রে তুমি ভালোই আছো নিরঞ্জন, ভারি বাঁধাবাঁধি; জীবনটা যেন গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ায়। নিজের পায়ে চলা যায় না, পরের ব্যবস্থায় ভেসে বেড়াতে হয়। বেশ আছো তুমি।

প্লাটফরমের শেষপ্রান্ত অতিক্রম ক'রে তারা গড়ানো জায়গাটা দিয়ে নেমে চললো। সম্মুখে কোনো আগল নেই, পিছনে কোনো বাঁধন নেই। সময় ও কাল মনেরই একটা বিভ্রম, সেটার আবরণ সরিয়ে ওরা দেখলে অতীত জীবনটাই এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে, বয়সের প্রশ্নটা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেল। শৈলবালার আচরণে সঙ্কোচ অথবা জড়তা রইলো না, কারণ, এই পুরুষের মধ্যে যে-অতি পুরাতন মানুষটাকে সে চেনে, সে অতি নিরাপদ। এই অন্ধকার পথে কালের ব্যবধান উত্তীর্ণ

হয়ে সে যেন স্বভাবের আদিযুগে এসে পৌঁছল, সংস্কার আর নীতিবোধ তখনও তাকে স্পর্শ করেনি।

নিরঞ্জন বললে, তোমার স্বামীকে খুব ভালো লাগলো বেশ পরিহাসবোধ আছে। বন্ধুর মতন ব্যবহার।

শৈলবালা বললে, মানুষটা দুর্বল, একটু ঠেলে ঠেলে চালাতে হয়। থাক্ স্বামীর কথা। বলো ত,' মিষ্টি গন্ধ কিসের এখানে, শ্রীকান্ত?

দেখতে পাচ্ছ না, ওই যে সব গাঁদার ঝোপ আর কাঠগোলাপ। সাবধানে এসো, রেল-লাইন প'ড়ে রয়েছে

শৈলবালা তার হাতখানা বাঁ হাতে ধরলো। বললে, চমৎকার লাগছে, কী নিরিবিলি। বেড়ালুম এতদিন ধ'রে পশ্চিমের এত দেশে, কিন্তু সত্যি বলছি শ্রীকান্ত, আজ যেন মনের রাশ আল্‌গা। ইচ্ছে হচ্ছে ব'সে পড়ি নরম ঘাসে, কী ঘন গন্ধ কুয়াসায়। কী রোমাঞ্চ বাতাসে।

নিরঞ্জন শান্তকণ্ঠে বললে, এখানে কেউ নেই, শুধু আকাশ আর তারা আর আমরা। এমন আশ্চর্য রাত।

শৈলবালা বললে, তার চেয়েও আশ্চর্য তুমি আর আমি। হঠাৎ গ্রহের চক্রান্ত এনে দিলে তোমাকে। কাল সকালে সূর্যের আলোও বিশ্বাস করতে পারবো না। চলো আরো এগিয়ে।

অনেক দূরে যাবে? দূরের গ্রামের দিকে?

হ্যাঁ, নিয়ে চলো। চলো যেদিকে খুশি।

যদি ফিরতে দেরী হয়? যদি ওরা খুজে বেড়ায়?

শৈলবালা বললে, ভালো, লাগছে না ফিরতে। রাতটা যেন নেশা, নিবিড় একটা মোহ। চলো, আরো যাই।

নিরঞ্জন বললে, অবাস্তব মনে হচ্ছে আজকের রাত, অদ্ভুত মনে হবে কাল সকাল। সেদিন তোমাকে চেনবার বয়স হয়নি, আজো চেনবার আগে তুমি চ'লে যাবে। এগারো বছর দেখিনি, সমস্ত জীবন না দেখলেও ক্ষতি মনে হোতো না, কিন্তু আজ দেখতে পেয়ে আর ছাড়তে মন চাইছে না। অতীত আর ভবিষ্যৎ সন্ধিস্থলে একবিন্দু কালের ওপর দাঁড়িয়ে যেন পরম-চেনা-অচেনার রহস্য।

রেলপথের সীমানা ডিঙিয়ে দু'জনে শহরপ্রান্তের অপরিচিত পথে উত্তীর্ণ হোলো। পথ জানা নেই, তার প্রয়োজনও নেই। দুই ধারে ফণীমনসার ঝোপ, মাঝে মাঝে মাঠ, মাঝে মাঝে কৃষ্ণকায় প্রহরীর মতো গাছের সারি। দুজনে স্খলিত জড়িত পদে চলতে লাগলো!

কিছুদূর গিয়ে নিরঞ্জন বললে, শৈল?

শৈলবালা তার কোমরে বাঁ হাতখানা জড়িয়ে বললে ফিরে যেতে ব'লো না···আমার ঘুম আসছে।

নিরঞ্জন তার কাঁধের উপর ডান হাত রেখে বললে, আজ তুমি পরের, তবু আমার লজ্জা করে না যদি বলি—

কি বলো ত?

যা ছোটবেলায় বলতে জানতুম না, এখন তাই মুখে আসছে। বলতে লজ্জা করে যা বলতে বাধে না।

শৈলবালা নিশ্বাস ফেলে বললে, দেরি হয়ে গেছে অনেক। তবু তোমার বলতে ভালো লাগে যদি, আমিও কান পেতে শুনবো, নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন বললে, সত্যি বল্‌ব, আনন্দের কান্নায় কাঁপছে সর্বশরীর। তোমার চুলের গন্ধে এগারো বছরের করুণ বিরহের সঙ্কেত। ভালোবাসার কথা বলবার বয়স নেই,—উত্তাপ জুড়িয়ে এসেছে, আর তোমার জীবনে ব'য়ে গেছে বাৎসল্যের বন্যা। আজ দুজনের দেহ নেই, আছে অতিত কল্পনা।

মৃদুকণ্ঠে শৈলবালা বললে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোনোদিনই বলতে পারিনি, কোনোদিনই বলা যেতো না। আজ সেই হারানো কৌমার্যের কথা মনে পড়ছে নিরঞ্জন, যখন নিজের দিকে চোখ পড়েনি, যখন অন্যের দিকে চোখ খোলেনি। সেই সময়কার আশ্চর্য অচৈতন্যের তুমি সঙ্গী। জানতেও চাওনি, আমিও জানাতে পারিনি। তারপর মাঝখানের বয়সটায় দেহটা পুড়ে ছারখার হোলো। আজ তোমাকে দেখে ফিরে পেলুম সেই নির্মল প্রাচীন আত্মা, তার চিরকৈশোর কখনই ক্ষুন্ন নয়। নিরঞ্জন, আজ তুমি রূপবান: বলবান—কিন্তু সেদিনকার সেই দুর্বল বালক আমার বড় আদরের, বড় আনন্দের। বিশ্বাস করতে পারো ?

নিরঞ্জন বললে, অবশ্যই পারি। তাই আজ নতুন ক'রে জানানো যায় না তুমি আমার কে। ঠিক বোঝাতে

পারিনে কী বল্‌ব এ সম্পর্কটাকে। আমি ভাই নয়, বন্ধু, নয় ভূপতিবাবু নয়—অথচ সমস্ত মিলিয়ে তোমার সঙ্গে কেমন যেন অন্ধ, নিগূঢ় নির্বোধ একটি আত্মার একাকার।

মুখ তুলে কম্পিতকণ্ঠে শৈলবালা বললে, থামতে দেবো না তোমাকে। বলো এই অন্ধকারে, বলো একটি রাতের জন্যে। একদিনও ভাবিনি, তোমার কথা এই এগারো বছরে, আজ তোমাকে ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না। তোমাকে দেবার কিছু নেই নিরঞ্জন, কিছু নিয়ে যাবারও পাত্র নেই—তবু যেন একটা প্লাবন মুক্তি চাইছে আমার বুকের রক্ততরঙ্গে।

পথের রেখা শাদা ধূলোর সঙ্কেত টেনে উত্তর-পূর্ব্ব থেকে পুনরায় দক্ষিণে ঘুরে গেছে। দুজনে ধীরে ধীরে চলেছে! নিশুতি রাত্রির অজানা পল্লার ভিতর দিয়ে তাদের পথ হারাবার ভয় নেই, ফিরে যাবার উদ্বেগ নেই, যেন একটা সর্বনাশা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বেপরোয়া অভিসার। আকণ্ঠ ঔৎসুক্যে রাত্রি চেয়ে রয়েছে তাদের পিছনে, সম্মুখে পথের রেখা নির্দেশ ক'রে উদাসিনী পৃথিবী চলেছে আঁচলের দাগ টেনে, আর উপরের হিমাঙ্গ আকাশ অগণ্য নক্ষত্রলিপিতে জানিয়ে চলেছে নব মিলনের অভিনন্দন। মধুর ক্লান্তিতে আর তন্দ্রায় দু'জনের চরণ অবসন্ন, জাগ্রত স্বপ্নে আর মোহমদির অচেতনায় তারা আতুর,—পথের ধারে ধারে প'ড়ে রইলো অভিসারিকার কেয়ুর-কুণ্ডল্‌-কঙ্কন আর চন্দ্রমালা,

প'ড়ে রইলো বাৎসল্য আর পাতিব্রত্য, দায়িত্ব আর কর্তব্য, ভয় আর সংস্কার—যেন ওরা আয়ু আর অস্তিত্বের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জীবন আর মৃত্যুর আনন্দ-বেদনা অঞ্জলি ভ'রে পান ক'রে নিচ্ছে।

নিরঞ্জন ?

এলো খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে নিরঞ্জনের বাহুর উপরে। শৈলবালার বিলোল অবশ দেহ যেন পথের ধারে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট স্বরে নিরঞ্জন বললে, কেন ?

কথা বেরুচ্ছে না কেন বলো ত ? গলা বুজে আসছে। আচ্ছা নিরঞ্জন, ভয় নেই ?

জানিনে শৈলবালা।

নিন্দে করবে না কেউ ?

বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, চলো এবার ফিরি। ওই যে ষ্টেশনের আলো দেখা দিয়েছে।

শৈলবালা জেগে উঠে একটি নির্বোধ আতুর চাহনিতে সেই দিকে তাকালো। তারপর মাথাটা হেলিয়ে তেমনি জড়িতকণ্ঠে বললে, যদি তোমার নিন্দে করে কেউ আমাকে দোষ দিয়ো। ব'লো আমিই তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে টেনে এনেছিলুম। ব'লো আমার মতন পাপিষ্ঠা পৃথিবীতে নেই।

নিরঞ্জন বললে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ? ওই যে, প্রায় আলোর কাছাকাছি এসেছি। এটা বোধ হয় অন্য গ্রাম।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শৈলবালা বললে, আর পারিনে। ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে রুদ্রের হাত থেকে সতী দেবীর অচেতন দেহের মতন আমিও ঝরে পড়ি তোমার হাত থেকে এই পথের ধারে খণ্ড খণ্ড হয়ে। আমার সেই ভগ্নাংশ দিয়ে হোক এই মহাভারতের সকল তীর্থক্ষেত্র। নিরঞ্জন, আর কিছুক্ষণ থাকি তোমার সঙ্গে, আরো ডুবিয়ে দাও অন্ধকারে, আরো নামিয়ে দাও আত্মার রহস্যের তলায়।

নিরঞ্জন ডাকলো, শৈল ?

কেন ?

বলতে পারো, আমাদের সম্ভ্রম কি ক্ষুণ্ণ হোলো ?

জানিনে ত'।

অপরাধ জমা হয়ে রইলো কি ?

মাথাটা নিরঞ্জনের কাঁধের উপর হেলিয়ে শৈলবালা বললে, আঁচল ভরে আমি আজ অনেক পেলুম তোমার কাছে। যাবার সময় আমাকে প্রণাম করতে দিয়ো। যদি তোমাকে ভুলিয়ে এনে থাকি অপরাধ নিয়ো না।

নিরঞ্জন বললে, কোনদিন ভাবিনি শৈল, আমাদের মধ্যে সেই দুই বালক-বালিকা এতদিন ধ'রে বেঁচে ছিল।

পথের জটিল আবর্তনে তারা কল্পনাই করেনি যে, ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় তারা ষ্টেশনেরই কাছাকাছি এসে গেছে। একরাশ আলো আর কোলাহলের মাঝখানে এসে দাড়িয়ে প্রথমটা তারা হতচকিত হয়ে গেল। আলোর এই অত্যুগ্রতায় দিশাহারা শৈলবালার সহসা

ইচ্ছা হোলো আবার সে ছুটে পালায় অন্ধকারে নিরঞ্জনের হাত ধরে। কিন্তু তার আর সময় ছিল না, হাত ঘড়িতে নিরঞ্জন দেখলে আড়াইটে বাজতে আর দেরি নেই।

চোখে তোমার জলের ধারা, মুছে ফেলো, শৈল। আমাকে ঠিকানাটা দিয়ো। এই ত ষ্টেসনে এসে গেছি।

শৈলবালা খোঁপাটা ফিরিয়ে বাঁধলো, হেসে মুছে ফেললো চোখের জল, আঁচল গুছিয়ে নিল, তারপর সকৌতুকে বললে, মনে করেছিলুম পৃথিবী ছাড়িয়ে গেছি। ঘানির চারিদিকে যে ঘুরেছিলুম কে জানতো।

নিরঞ্জন বললে, তোমার গাড়ী ছাড়বে এবার, শিগগির এসো।

শৈলবালা বললে, কই তোমার পায়ের ধূলো নিলুম না ত'?

নিরঞ্জন হাসিমুখে দুই হাত দিয়ে তার দুই গাল সস্নেহে ধ'রে বললে, মাথায় বড় কিন্তু বয়সে যে এক, মনে নেই? আজ থাক্, পায়ের ধূলো দেবো গিয়ে তোমার শয়ন মন্দিরে।

হাসি তুলে শৈলবালা বললে, আচ্ছা সেই ভালো নিরিবিলি।

কিন্তু এমন প্রণয়কাহিনীর পরিশিষ্টটুকু তখনো যে বাকি ছিল, নিরঞ্জন সে কথা একটিবারও কল্পনা করেনি। হন্তদন্ত হয়ে ওয়েটিং রুমের কাছাকাছি আসতেই পিছন থেকে একটি বউ কাঁদো কাঁদো হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,

ওগো, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? আমি যে কত খুজছি! উনি কে তোমার সঙ্গে?

শৈলবালা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো, নিরঞ্জন বিমূঢ় হতবুদ্ধি। বউটি কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, এঁকে ত চিনতে পারলুম না?

এঁকে? এঁকে চিনতে পারবে না বটে—নিরঞ্জন বললে, ইনি আমার বন্ধুস্ত্রী,—দাঁড়াও আর এক সেকেণ্ড এঁকে স্বামীর কাছে পৌছে দিয়ে আসি। আসুন বৌদি—

যে বৌকে দেখার জন্য অত আগ্রহ ছিল দুঘণ্টা আগে, এখন তার প্রতি কোনো আকর্ষণই আর শৈলবালা খুঁজে পেলো না, কথা ক'য়ে সৌজন্য প্রকাশ করতেও রুচি হোলো না। তার বিবর্ণ মুখখানা ক্রমে রক্তাভ হয়ে উঠলো। বিশ্রী একটা উত্তেজনা আর অসীম বিরক্তি মনে মনে দমন ক'রে সে সুধু বললে, তখন স্বীকার করোনি কেন যে, বিয়ে করেছ?

নিরঞ্জন ক্লিষ্টকণ্ঠে একবার বলবার চেষ্টা করলো,— তোমার সঙ্গে একা থাকতে পারবো সেই লোভে শৈলবালা।

এতও জানো তোমরা।—থাক্ আর আসতে হবে না। —এই বলে আঁচল দিয়ে মুখখানা ভালো ক'রে মুছে সে দ্রুতপদে তাদের ওয়েটিং রুমে গিয়ে ঢুকলো।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

রাত নয়টার সময় দিল্লী ষ্টেশনে আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন পৌছিল। বোম্বাই-বরোদা লাইন দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় টুণ্ডলা হইতে এই গাড়ী ধরিয়াছি, সুতরাং মনে করিয়াছিলাম দিল্লী ষ্টেশনেই রাত্রির আহার সাঙ্গ করিব। গাড়ী পনেরো মিনিট কাল দাঁড়াইবে, অতএব ষ্টেশনের হোটেলে কিছু খাইয়া কিছু বা সঙ্গে লইয়া এক রকম করিয়া ব্যবস্থা করিব।

মে মাসের মাঝামাঝি। গতকাল সন্ধ্যা হইতে ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছি—বালুর ঝড়ে ধূলিরাশির ঝাপটে জলের অভাবে আজ সারাদিন ধরিয়া রাজপুতনার সমস্ত পথটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহে সিদ্ধ হইয়াছিলাম, রাত্রি নয়টায় এখনও ঠাণ্ডা বাতাস কোথাও নাই, বরং চারিদিক অবরুদ্ধ

ষ্টেশনের ভিতরটায় যেন একটা গুমটের সৃষ্টি হইয়াছিল। আগুনের খাপরার ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমি প্রথমে একটু শীতল পানীয়ের অন্বেষণে-এদিক ওদিক ছুটিলাম।

ঠাণ্ডা জল হয়ত পাইতাম কিন্তু ক্লান্ত দেহে খুঁজিয়া বাহির করিবার আর উৎসাহ নাই, সুতরাং ষ্টেশনের এক রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিয়া বরফ জল হুকুম করিলাম। জল আসিল। জল খাইয়া কিছু মালাই রুটি মিঠাই ও ফল অর্ডার করিয়া খাইতে বসিয়া গেলাম।

মনে করিয়াছিলাম আহারাদি শেষ করিয়া যদি মিনিট পাঁচেক সময় পাই তবে প্লাটফরমের পাইপে স্নান করিয়া লইব, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না আলীগড় ষ্টেশনের বাথরুমটা অবহেলা করিয়া খুবই ভুল করিয়াছি, তখন সময়ও হাতে ছিল। আগামী কাল প্রভাত ছাড়া স্নান করিবার আর কোনো উপায় নাই।

আহার শেষ করিয়া পয়সা চুকাইয়া এক লোটা জল হাতে লইয়া যখন বাহির হইয়া আসিলাম তখন আর সময় নাই, গাড়ীর তৃতীয় বেল পড়িয়া গিয়াছে। দূরে সবুজ সিগ্‌নাল্ দিল, গার্ড বাঁশী বাজাইল—আমি তাড়াতাড়ি আমার কামরায় আসিয়া উঠিলাম।

চালাক-চতুর যুবক হইয়া এমন একটা দ্রুত মুহূর্তে যে এমন ভুল করিব তাহা জানিতাম না। নিজের কামরায় না উঠিয়া অন্য কামরায় তাড়াতাড়িতে উঠিয়া

পড়িয়াছি প্রথমেই তাহা উপলব্ধি করিলাম। সকল তৃতীয় শ্রেণীর চেহারা একই, কেবল চাক্ষুষ পরিচয়ের যে সকল আরোহী তাহাদের চেনামুখের সঙ্কেত পাইয়া কামরা চিনিয়া লই, কিন্তু এক্ষেত্রে নূতন মানুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়া ভুল বুঝিলাম। গাড়ী নড়িতে ও দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি দ্রুত নামিয়া নিজের কামরার দিকে ছুটিব—এমন সময় দরজায় বাধা পাইলাম। একব্যক্তি আমার পথ অবরোধ করিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। লোকটি আমাকে বাধা দিয়া জানাইল—ইহাই আমার কামরা, ঠাহর করিতে না পারিয়া নামিয়া যাইতেছিলাম। গরমের চোটে মাথার ঠিক ছিলনা, এইবার ভালো করিয়া চাহিলাম। দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া যাহাদের দেখিয়াছিলাম তাহারা অনেকেই আছে, নূতন যাত্রীও দুই চারিজন উঠিয়াছে। নিজের জায়গায় আসিয়া নিজের পাতা বিছানাটা চিনিলাম বটে, কিন্তু তাহা একটি স্ত্রীলোককে দখল করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

স্ত্রীলোকটির অভিভাবক কে তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, ই হমারি সীট হায়, ছোড় দিজিয়ে ?

মেয়েটি মুখ তুলিল। বয়স তাহার অল্প, চেহারাটা সুন্দর, সর্বাঙ্গে রেশমের পরিচ্ছদ ; মনে হইল গলায় এক ছড়া শাদা মুক্তার মালা ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বিপরীত

বেঞ্চের উপর একখানা পা সে তুলিয়া দিয়াছিল—সেই পায়ে তাহার অলক্তক এবং মখমলের ফিতা-বাঁধা জুতা। তাহার মুখে এক মুখ পান, দুই কানে দুইটা দুল। মুখ তুলিয়া সে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, আপকো বিছওয়ানে ?

জী।

বুঝিলাম এই গরমে জানালার ধারের বাতাস ছাড়িয়া তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার হাসিমুখের উত্তরে আমার গম্ভীর ও সংযত মুখের চেহারা দেখিয়া সে বসিতে সাহস করিল না।

মাঠের ভিতর দিয়া ট্রেন তখন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে! জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া সে বিপরীত বেঞ্চে আমার আসনের সম্মুখেই নিজের জায়গা করিয়া লইল। আমি তখনও বুঝিলাম না—কে মেয়েটির অভিভাবক। এক সময় তাহার দুইখানা হাত নড়িতেই লক্ষ্য করিলাম, দুই হাতে প্রচুর সোনা ও জড়োয়ার অলঙ্কার। গাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই, কিন্তু সেজন্য তাহাকে আড়ষ্ট হইতে দেখিলাম না, বরং মাথার ঘোমটা একটু কমাইয়াই সে সপ্রতিভভাবে বসিয়া রহিল।

আমার আচরণে সে খুশী হয় নাই শীঘ্রই তাহার প্রমাণ পাইলাম কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা মিশাইয়া এক সময়ে সে প্রশ্ন করিল, শামান্ ক্যটায় লেঁই ?

বুঝিলাম তাহারই মালপত্রে দুইটা বেঞ্চের মধ্যস্থল প্রায় ঠাসাঠাসি, হাত পা ছড়াইতে আমার খুবই অসুবিধা

হইবে, কিন্তু তাহাকে আর ব্যস্ত না করিবার জন্য সংক্ষেপে জবাব দিলাম, রহেন দিজিয়ে।

মেয়েটি সহসা পুনরায় প্রশ্ন করিল, আপ কিংনা দূর যায়ঙ্গে ?

বলিলাম, শিম্‌লা। কাল্‌কেমে উতর্‌ না।

ফজিরমে ?

জী। এই বলিয়া সৌজন্যের খাতিরে আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম, আপ কিধর্‌ চল্‌ রহা হেঁ ?

লুধিয়ানে। সে জবাব দিল। বলিল, বদ্‌লি হায় বীচ্‌মে। ম্যা আতা হুঁ বোম্বাইসে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার বলিবার আগেই বুঝিয়াছিলাম সে বোম্বাই হইতে আসিতেছে। আমেদাবাদ ওয়াধওয়ান ও আজমীর হইয়া সে দিল্লীতে আসিয়া এই গাড়ী ধরিয়াছে। ভাবিলাম, বোম্বাই না হইলে আর এমন স্বাধীন তরুণী কোথা হইতে আসিবে ?

আমার একসময়ে সে কথা কহিল। বয়সের দোষে এবার আমি একটু পুলকিত হইলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল, কসুর না লিজিয়ে, আপকো নাম ?

জবাব দিলাম, বিরিজলাল শেঠী। আপ্‌কো ?

সে হাসিয়া কহিল, জেনানেকো নাম বোল্‌না কুছ সরম লাগ্‌তা হুঁ।

মনটা সরস হইয়া উঠিল। বলিলাম, কুছ নেহি।

সলজ্জকণ্ঠে সে কহিল, রামকুমারী।

নিজের কাছেই আমি চরিত্রবান বলিয়া পরিচিত ছিলাম, কিন্তু নিজের নাম বলিতে গিয়া রামকুমারীর মুখের উপরে যে রক্তাভাস ফুটিল তাহারই চিত্র নিজের মনে মুদ্রিত করিয়া একটুখানি চিত্তবিলাস করিতে ইচ্ছা জাগিল। মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া একবার মনে করিলাম, আমার জায়গাটা পুনরায় তাহাকে ছাড়িয়া দিই, কিন্তু আশেপাশে দুই চারিজন কৌতূহলী যাত্রীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া নিজেকে সংযত করিলাম। একবার যাহাকে তাড়াইয়াছি পুনরায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে মন উঠিল না। হৃদয়বৃত্তির দুর্বলতা বরং চাপিতে পারিব, কিন্তু আমার কোনো গভীর বাসনা ইহাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে একেবারে মাথা হেঁট হইয়া যাইবে। তাহা পারিব না।

আলাপের যবনিকা ওইখানেই পড়িল না। আমার চোখে ও মুখে যদি সুদূর অনুরাগের কোনো চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত তাহা হইলে কি ঘটিত বলিতে পারিনা, কিন্তু সম্ভবত আমার মুখে আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সংযমশ্রী লক্ষ্য করিয়া রামকুমারী সহজকণ্ঠে পুনরায় আলাপ সুরু করিল। আলাপের মধ্যে অন্তরঙ্গতার রং বুলাইবার চেষ্টা পরস্পরের দিক হইতেই ছিলনা, কেবলমাত্র এই ক্ষণস্থায়ী পথযাত্রায় উভয়কে মোটামুটিভাবে জানিবার একটি আগ্রহ জন্মিল। আমি চরিত্রবান হইলেও এমন একটি সুন্দরী তরুণীর সহিত আলাপ দীর্ঘতর করিবার লোভ

সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং নিজের একাকীত্বকে এড়াইয়া সময়টা যে ভালোই কাটাইতে পারিব এই মনে করিয়া বেশ ভব্য হইয়া তাহার সহিত প্রশ্ন ও উত্তরের খেলা খেলিতে লাগিলাম।

তাহাকে জানাইলাম আমার বাড়ী কাথিয়াবাড়ে, রাজকোট হইতে ষাট মাইল পশ্চিমে নন্দগাঁও নামক স্থানে। আমরা বিখ্যাত শেঠী পরিবার। আমাদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র আমেদাবাদ এবং পুরুষানুক্রমে আমরা রেশম ব্যবসায়ী। জয়পুর, আজমীঢ়, আগ্রা ও দিল্লীতে আমাদের শাখা প্রতিষ্ঠান আছে। সম্প্রতি শিমলায় যাইতেছি একটি শাখাকেন্দ্র খুলিবার জন্য। আমার পিতামাতা জীবিত। আমার পাচ ভাই ও এক ভগ্নী। বীজনৌরের রাজ-পরিবারে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে। আমার উপরে তিন ভ্রাতাও বিবাহ করিয়াছেন।

নিজের পরিচয় দিয়া তাহার পরিচয় লইব ভাবিতেছি —এমন সময় ও-পাশের একটি লোক রামকুমারীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। লোকটি দীর্ঘাকার এবং আমার অপেক্ষা বলিষ্ঠ। এতক্ষণ কোনো রকমেই বুঝিতে পারি নাই যে, লোকটি রামকুমারীর অভিভাবক, এইবার জানিতে পারিয়া আমি যেন সহসা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাহার সহিত কোনরূপ অভব্য আচরণ করিয়া ফেলি নাই। এত ঘটা করিয়া নিজের পরিচয় দিবার আমি যেন কোনো সঙ্গত

কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না এবং রামকুমারীরও অধিকতর পরিচয় পাইবার আগ্রহ আমার কমিয়া গেল। নিজের দুর্বলতা গোপন করিব না। যতই চরিত্রবান বলিয়া বড়াই করি না কেন, রামকুমারীর সঙ্গী কেহ নাই এই মনে করিয়া আমার যুবক-পুরুষের মন একটু অহেতুক উল্লাসে মাতিয়াছিল, কিছু পুলক-শিহরণেরও সাড়া পাইয়াছিলাম, কিন্তু এতক্ষণে সহসা ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহার পরে আমি ভোঁতা মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া অন্ধকারের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। বোকা বনিয়া গিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃত্রিম মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া মেয়েটাকে যে নিজের জায়গাটা ছাড়িয়া দিই নাই এইকথা মনে করিয়া কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। স্বার্থপরতার জন্যই এ যাত্রায় আত্মসম্মানটা বাঁচিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া তাহাদের আলাপটা দেখিবার সাহস ছিল না, তবু নড়িয়া চড়িয়া বসিবার ভান করিয়া এক সময় সমস্ত দেখিলাম। লোকটি পানের কৌটা বাহির করিল এবং পান ও কিমাম বাহির করিয়া সে সাদরে রামকুমারীকে খাইতে দিল। যে-বিবেচনাটা আমি এতক্ষণ রামকুমারীর প্রতি প্রকাশ করিতে পারি নাই, দেখিলাম লোকটি তাহাকে সেই স্বাচ্ছন্দ্য দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে সঙ্কীর্ণভাবে থাকিয়া রাম-কুমারীকে আরাম করিয়া বসিবার জন্য অনেকখানি জায়গা

করিয়া দিল, বিছানাটা এলাইয়া পাতিয়া দিল এবং বাতাস খাইবার জন্য একটি ঝালর-বাঁধা পাখা বাহির করিল। যত্ন, আরাম ও তোষামোদ পাইলে স্ত্রীলোকেরা যে কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে তাহারই একটা জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দেখিয়া আমার মনে মনে যেন একটু ঈর্ষার উদ্রেক হইল। এখন হইতে এই কথাটা মনে রাখিব, সম্মান দেখাইয়া নারীর হৃদয় জয় করা কঠিন, বরং তাহার রূপশ্রীর যোগ্য মূল্য দিলে স্ত্রীলোক সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। বুঝিলাম আমি উহার মনে কোন দাগ কাটিতে পারি নাই। একবার যেন আমার সন্দেহ হইল, অভিভাবক বলিয়া যাহাকে মনে করিয়াছি তাহার সহিত অভিভাবকত্বের সম্পর্ক অপেক্ষা বন্ধুত্বের অনুরাগের সম্পর্কটাই যেন অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

অন্ধকার রাত্রি বিদীর্ণ করিয়া আমাদের এক্‌স্‌প্রেস ট্রেন পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া ছুটিতেছিল। বাতাসে গরমের ভাব অনেকটা কাটিয়াছে। হাতঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি এগারোটা বাজে। একাকী থাকিলে সময় কাটিত না, কিন্তু নারীর ছোঁয়াচ থাকার জন্য তুইটা ঘণ্টা যেন পলকের মধ্যেই পার হইয়া গেল। বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু বালকের ন্যায় আমার যেন মনে হইতে লাগিল আমি মস্ত বড় একটা সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, অনেকদিন অবধি আমার ভিতরটা হায়

হায় করিতে থাকিবে। আমি যেন মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, আমার পিছন দিকে বসিয়া ওই কদাকার ষণ্ডামার্ক লোকটা পান চিবাইতে চিবাইতে আমাকে লইয়াই রামকুমারীর সহিত হাসাহাসি করিয়া আসর জমাইতেছে!

নব্য যুবকের এই অবস্থায় যাহা মনে হয়, আমারও তাহাই মনে হইল। খামোকো এই তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, এই সুন্দরীর সহিত যখন আমার অন্তরঙ্গতা হইল না তখন অবশ্যই আমার জীবন ব্যর্থ। ট্রেনের ভিতরে বসিয়া রাত্রির এই দোলায়মান ক্ষণস্থায়ী মোহ-মুহূর্তগুলির উপরে নিজের ব্যর্থতাটা ঘষিয়া যখন পরীক্ষা করিতেছিলাম এমন সময় সহসা রামকুমারীর মধুর কণ্ঠস্বর কানে বাজিল —বিরিজলালজী?

মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিলাম এবং তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে কহিলাম, ফরমাইয়ে?

সে কহিল, ঘুম পাচ্ছে না আপনার?

বলিলাম, এখন পায়নি।

উত্তরটা শুনিয়া দুইজনে যেন কৌতুকবোধ করিল। আমার নিদ্রার সংবাদ লইতে তাহাদের এই আগ্রহ ও কৌতুক কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি পুনরায় মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তাহাদের হাসির আওয়াজ আমার কানে আসিল, আমি যেন তাহাতে চাবুকের আওয়াজ অনুভব করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

এইবার যে দৃশ্যের বর্ণনা করিব তাহাতে নীতি ও রুচির প্রশ্ন উঠবে জানি; কিন্তু ভয় নাই, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা ঘটিবে সেখানে ইঙ্গিতেই কাজ সারিয়া আমি নীতিবিদের সম্ভ্রম বাঁচাইয়া যাইব। আমি নিজে রুচি ও চরিত্রবত্তা প্রকাশ করিয়া এখনই এই কাহিনীর সমাপ্তিরেখা টানিয়া দিতে পারি—কিন্তু যাহারা শ্লীলতা ও সম্ভ্রমবোধকে গ্রাহ্যই করে না, যাহারা ভদ্রসমাজের গায়ের উপর পড়িয়া দুরন্তপনা করিয়া যায়, তাহারাও জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের বাদ দিয়া চলিতে হইলে পৃথিবীর মোটা অংশটার সহিত কাজ-কারবার চলে না—ইহা অস্বীকার করিবে কে?

বোধ করি সমস্ত কামরায় যাত্রীগুলি ঘুমাইয়া পড়িবে এমনি একটা অবস্থা দুইজনে কল্পনা করিতেছিল। শীতকাল হইলে তাহাদের সে কল্পনা সত্য হইত, কিন্তু গ্রীষ্মের গুমটে তাহা আর হইয়া উঠিল না, দুই চারিজন জাগিয়া রহিল। আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম, কিন্তু কানের কাছে মৃদু চুড়ির আওয়াজ, টুকরা হাসি, গদগদ কণ্ঠ, শাড়ির মরমরানি পরিহাস-সরস আলাপ—এইগুলি শুনিতে পাইলে নব্য যুবকের চোখে ঘুম আসিবে এত বড় অপৌরুষ আমার নাই। আমি ঘুমাইবার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমি যেমন ভদ্রতা করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম, আমাদের কামরার জাগ্রত যাত্রীরা তাহা করিল না, তাহারা সকৌতুক পরিহাসের সহিত

রাজকুমারী ও তাহার সঙ্গীর প্রণয়কাণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ও নির্লজ্জ ভঙ্গী অনুভব করিয়া আমি পাথরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। বাল্য-কাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, পাকা-ফলের মাধুর্য আস্বাদ করিতে হইলে ফল পাকিবার সময় দেওয়া দরকার, কিন্তু প্রণয়কাহিনীতে বোধ হয় ইহার বিপরীত একসঙ্গে অনেকগুলি ধাপ ডিঙাইয়া দ্রুত অগ্রসর না হইলে সুফল পাওয়া যায় না। ইহাদের কোনো কোনো কথার ছিটা আমার কানে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা মাদকতারসে এতই জড়িত ও অপরিস্ফুট যে তাহার অর্থসঙ্গতি খুঁজিয়া পাইলাম না। এক সময়ে তাহারা সহসা চুপ করিলে আমি ভয় পাইয়া অলক্ষ্যে চোখ খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী স্ত্রী যেমন অন্তরঙ্গ হইয়া বসে উহারা তেমনিভাবে বসিয়া অতিশয় চাপা কণ্ঠে আলাপ করিতেছে এবং রাজকুমারী মাথার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। অনেকেই তাহাদের পিছন দিক হইতে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু আমিই একমাত্র যাত্রী তাহাদের সম্মুখস্থ বেঞ্চে আড় হইয়া বসিয়া আছি, সুতরাং আমি যতটা তাহাদের কীর্তিকলাপ দেখিতে পাইব এমন আর কেহ পাইবে না। আমি ঘুমাইয়া পড়িলেই তাহারা খুশি হইত।

এক সময়ে পুনরায় চোখ বুজিলাম। সত্য বলিব, বাতাস লাগিলে যেমন নদীতে তরঙ্গদল জাগিয়া উঠে

আমার মনের অবস্থা সেইরূপ হইল। প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ঘুম আসিল না। উহারা কথাবর্তা হাসি তামাসা করিলে বরং ঘুম আসিত, কিন্তু নীরব হইয়া গেলেই ছাঁৎ করিয়া আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা অনুভব করিলাম আমি না ঘুমাইলেও উহাদের কিছু আটকাইবে না এবং যেহেতু উহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, লজ্জা, সরম, নীতি, রুচি, সভ্যতা ও ভদ্রতা কিছুই মানিবে না—সেই হেতু আমাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া উহারা সকলের চোখের উপর নিজেদের জন্য একটা পৃথক্ জগতের সৃষ্টি করিয়া লইল। সকলে উহাদের দেখিলেও উহারা কাহাকেও লক্ষ্য করিবে না। এমনি করিয়া দৃশ্যটা যখন ইতর হইতে ইতরতর হইয়া উঠিল, আমি তখন সমগ্র পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম এবং গাড়ীখানা সকলকে কোলে লইয়া প্রচণ্ড দোলায় দোলাইয়া গমগম করিয়া ছুটিতে লাগিল।

কতকক্ষণ পরে জানিনা, এক সময় রেল লাইন পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া যাহা সহসা আমার চোখে পড়িল তাহাতে সত্য সত্যই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম সমস্ত জায়গাটা জুড়িয়া রামকুমারী তাহার সুন্দর দেহখানি ছড়াইয়া শুইয়া আছে এবং তাহার সঙ্গীটি তাহার নিকট নাই। এদিক ওদিক চাহিলাম কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঝড় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিদ্যুৎলতাটি

নিশীথিনীর কোলে যেন স্থির হইয়া আছে। রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাদের ট্রেন আম্বালা ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া একরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণায় ডুবিয়া ছিলাম—এমন সময় রামকুমারী উঠিয়া আমাকে ডাকিল, বিরিজলালজী?

হয়ত আমার মনেরই ভুল হইবে, আমি তাহার কোমল ও শান্ত কণ্ঠস্বরে একপ্রকার অসহায় ও করুণ আবেদন শুনিলাম। উত্তর দিলাম, কেন?

লুধিয়ানার গাড়ী কখন জানো?

আমি তাহার সহিত পুনরায় আলাপ করিব কিনা বিচার করিতে লাগিলাম।

সে পুনরায় কহিল, এদিকের রাস্তাঘাট আমি ভালো জানিনে, একবার মাত্র এসেছিলাম।

বলিলাম, তোমার সঙ্গী কোথায় গেল?

সঙ্গী?—রামকুমারী কহিল, সঙ্গী আমার কেউ নেই বিরিজলালজী।

আমার বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া মায়াবিনী হাসিল, বলিল, তার সঙ্গে পথেই আলাপ, সে নেমে গেছে। বিরিজলালজী, এই আমার পেশা।

যে আন্তরিকতা ও সত্যের প্রেরণায় সে লোকলজ্জাকে অস্বীকার করিয়া দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া এক বর্বরের সহিত বিলাস করিয়াছে, সেই আন্তরিকতা ও অকপটতা তাহার কোমল

কণ্ঠস্বরে আমি শুনিতে পাইলাম। এমন করিয়া সে আমার দিকে চাহিল যে, সেই দৃষ্টির ভিতর আমি আবহমান-কালীন নারীপ্রকৃতির পরাশ্রিতপরতার চেহারা দেখিতে পাইলাম। সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটু আগে পর্যন্ত যাহাকে ঘৃণা করিয়াছি, সমস্ত হৃদয় তাহার প্রতি করুণায় ভরিয়া উঠিল। বলিলাম, এই রাত্রে একা কোথা যাবে তুমি, রামকুমারী? গায়ে এত অলঙ্কার, এত জিনিষপত্র—

গাড়ী তখন ষ্টেশনে থামিয়াছে। সে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কহিল, যদি ভরসা দেন্ তবে একটা কথা বলি।

নতমস্তকে সে কহিল, আপনার চোখের সামনে আমি নোংরামি করেছি, বড় অধম আমি, তবু আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

বলিলাম, আমিও ত' মন্দ লোক হ'তে পারি। জানো, তোমার প্রতি আমারো লোভ রয়েচে?

সে কহিল, শেঠজী, লোভীর হাতেই হয়ত একদিন আমাকে মরতে হবে। লোভী ছাড়া 'মরদের' অন্য চেহারা আমি দেখি নাই। আপনার লোভের বস্তুই আমি হ'তে চাই।

আমাকে কি করতে বলো?

রাত 'আঁধিয়ারা'—একলা যাওয়া বড়ই শক্ত। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন লুধিয়ানায়।

সময় তখন অল্প। সম্মুখে একাকিনী রমণী, চক্ষু দুইটি নিদ্রারসে ভরা, রেশমী পরিচ্ছদের উপর ষ্টেশনের আলো পড়িয়া তাহাকে রূপলোকবাসিনীর ন্যায় মনে হইতেছিল। আমার বুকের ভিতরটা এই দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত জগতের সকল নব্য যুবকের মতোই তোলপাড় করিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, চলো।

কি কাণ্ড করিয়া বসিলাম জানি না, কেহ আমাকে দেখিয়া কি মনে করিতেছে তাহাও বুঝিলাম না, আমার এই কার্য্যের পুরস্কার অথবা গৌরব কি, তাহাও বিচার করিয়া দেখিলাম না—ঘুম চোখে নিশি পাওয়ার মতো, প্রেতিনীর সঙ্কেতে পথ হাতড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিলাম। দিবালোক হইলে হয়ত একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমি আমার এই নির্বোধ হঠকারিতাকে সংযত করিতে পারিতাম, যুক্তিশাস্ত্র হইতে নজীর তুলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতাম, নীতি ও চরিত্রবত্তার প্রশ্ন আনিয়া আমার এই নিঃসঙ্কোচ লজ্জাহীনতাকে চাবুক মারিতাম, কিন্তু সেই নিবিড় রাত্রে ষ্টেশনের সেই রহস্যময় প্রদীপালোকে অজানা দেশের স্বপ্নময় পথে পরমাসুন্দরী এক রমণীর ইসারায় আমি আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইলাম। সে আমাকে কোন্ কল্পলোকে লইয়া চলিল কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না।

মালপত্র সমেত কোন্ গাড়ীতে কখন উঠিয়াছি কখন গাড়ী ছুটিতে সুরু করিয়াছে, কোন্ পথ কোথা দিয়া পার

হইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন চৈতন্য ফিরিল, দেখিলাম, লুধিয়ানা ষ্টেশনে নামিয়াছি। পূর্বাকাশে ঈষৎ শাদা রঙ ধরিতেছে।

বলিলাম, কোথায় যাবে এবার ?

রামকুমারী বলিল, অনেক তখলিপ্ তোমাকে দিলাম, গিরিজলালজী। আমার কাজ এখানে সামান্য, এখুনি কাজ সেরে আবার ফিরে যাবো।

সামান্য কাজের জন্য সে বোম্বাই হইতে এই প্রায় এক হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে আমার মন উঠিল না। বলিলাম, সেটা কি ভালো হবে ? বরং দুদিন বিশ্রাম ক'রে যেয়ো।

বিশ্রাম ?—রামকুমারী হাসিয়া কহিল, বেশ, তুমি যা বল্‌বে তাই হবে। ম্যানে আপ্‌কো বাঁন্দী বন্‌গৈ !

রাত্রে যাহা লক্ষ্য করি নাই, এখন তাহা চোখে পড়িল। দেখিলাম, তাহার অনেকগুলা লগেজের সহিত এক টুক্‌রি পরিপূর্ণ ফুল! সেই রাশীকৃত নানাবিধ ফুলগুলি তাজা রাখিবার জন্য জলের ঝারির বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম, হাজার মাইল দূর থেকে এত ফুল এনেছ কেন ?

সে কহিল, ঠাকুরের পায়ে এই ফুল দেবো, শেঠজী।

কথাটা আমার ভালো লাগিল না, ইহা যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হইল। জীবনে যাহার শুচিতার অভাব আছে এবং যাহার দৈনন্দিন আচরণে কপটতা ও লোভ

ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উদ্দেশ্য নাই—সে যত বড় সুন্দরীই হউক, তাহার এই আত্ম-প্রতারণাশীল ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া আমার গা জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া রামকুমারী আমার ও তাহার লগেজগুলি ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিল এবং একখানা টাঙাগাড়ী ডাকিয়া আমাকে উঠিতে বলিল ও নিজে ফুলের সেই বড় টুক্‌রিটা লইয়া আমার পাশে উঠিয়া বসিল। বলিল, এবার আমি বোধ হয় তোমাকে চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় যাবে ?

সে কহিল, পৃথিবী ছাড়িয়ে।

বলিলাম, বাংলাইয়ে ক্যা মৎলব ?

রামকুমারী হাসিয়া কহিল, যাবো মৃত্যুর মন্দিরে।

বলিলাম, মেরি পিয়ারী, দিনের আলোয় তোমার কথায় আর নেশা লাগবে না। কোথায় যাবে বলো শুনি ?

সে কহিল, বেহেস্ত্‌।

গাড়ী দ্রুতগতিতে শহরের প্রান্ত দিয়া চলিয়াছে। সেই নিরুদ্দেশ পথের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলাম, যেতে রাজি আছি, তবে ঘোড়ার গাড়ী ততদূর যেতে পারবে না।

উত্তরে সে কেবল আমার কাঁধের পাশে মাথা রাখিয়া বলিল, কী সুন্দর তোমার ব্যবহার, বিরিজলালজী ?

বলিলাম, এই কথা তুমি শত শত লোককে বলেছ, রামকুমারী।

রামকুমারীর মুখের হাসি মরিয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিল। মনে হইল সে একটু আঘাত পাইয়াছে। ধীরে ধীরে এক সময় বলিল, যাচ্চি বাং শেঠজী।

অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া একসময়ে রামকুমারীর ইঙ্গিতে টাঙ্গাগাড়ী একটা জনবিরল প্রকাণ্ড বাগানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে একজন অন্ধ ভিক্ষুক বসিয়াছিল। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রামকুমারী গাড়ী হইতে নামিল এবং সেই ফুলের টুকরিটা লইয়া বাগানে প্রবেশ করিবার পথে বৃদ্ধ ভিক্ষুককে কিছু ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল, কিন্তু এই যাত্রার শেষ পরিণতি দেখিয়া যাইবার জন্য আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সূর্যের আলো দেখিতে দেখিতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া দুই একজন সব্জীওয়ালাকে মোট মাথায় লইয়া শহরের দিকে যাইতে দেখিলাম, বার বার হাতঘড়ি তুলিয়া সময় গণিতেছি, কিন্তু রামকুমারী সেই যে গিয়াছে আর দেখা নাই। সমস্তটাই যেন রহস্যময় মনে হইল। আমি ইহার ফাঁদে পড়িয়াছি কিনা তাহাও সভয়ে ভাবিতে লাগিলাম।

একটা হেস্তনেস্ত করিব এই মনে করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আমিও বাগানে প্রবেশ করিলাম। পাঞ্জাবের

এই রুক্ষ ধূসর ভূভাগে এমন একটি বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ মধুর বায়ুহিল্লোলিত সুন্দর উদ্যান দেখিব আশা করি নাই। গাছে গাছে প্রভাতী পাখীর কলকাকলী তখনও চলিতেছিল, তখনও দূরে কোথায় শিখগণ গ্রন্থসাহেবের ওঙ্কার-ধ্বনি তুলিয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রভাতী গাজন গাহিতেছিল। আমি সেই পুষ্পলতাচ্ছাদিত বনময় উদ্যানের একটি জলধারাযন্ত্রের পাশ দিয়া আসিয়া এক সময় স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। যে দৃশ্য দেখিলাম তাহার সহিত চারিদিকের লতাবৃক্ষের শোভা, পাখীগণের প্রভাত বন্দনা, তরুণ সূর্যের রক্তরশ্মি, জলধারাযন্ত্রের অবিশ্রান্ত মর্মরধ্বনি, বায়ুর মধুর স্পর্শ, বসন্তপুষ্পদলের সুগন্ধ সমারোহ—এই সমস্ত না মিলাইয়া দেখিলে তাহার মূল্য বুঝা যাইবে না। দেখিলাম, একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত পুষ্পাচ্ছাদিত সমাধির উপরে স্বর্ণলতার ন্যায় রামকুমারী পড়িয়া আছে। তাহার সেই নিশ্চল প্রণতি মূর্তি দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলাম, রামকুমারী ?

সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম। দেখিলাম অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু, ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতেছে।

বলিলাম, তুমি ত' হিন্দুর মেয়ে, রামকুমারী ?

সে আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, দেবতার পায়ের কাছে কোনো জাত নেই, শেঠজী।

কে আছে এই সমাধিতে ?

আমার প্রিয়। 'মেরে দেওতা'।

ইহার পরে আর কিছু জানিবার বা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। তাহাকে লইয়া বাগানের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শুনিলাম আজ তাহার প্রিয়ের মৃত্যু তিথি, দুই বৎসর পূর্ব্বে রামকুমারীর সেই প্রণয়ীর মৃত্যু হইয়াছে। এই উদ্যান তাহার সম্পত্তি এবং প্রতি বৎসর তাহার মৃত্যুতিথিতে রামকুমারী বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়া ফুল দিয়া যায়। প্রেমিকের মৃত্যুর পর রামকুমারী বোম্বাইতে গিয়া অভিনেত্রীর জীবন যাপন করিতেছে। যে কাহিনীটুকু আহরণ করিলাম তাহা সংক্ষিপ্ত। ধনীর পুত্র তাহার প্রণয়ী পাঞ্জাব হইতে গোয়ালীয়র অরণ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়াছিল—রামকুমারী গোয়ালীয়রের কোন্ এক সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা—দুর্গপ্রাকারের বাহিরে নৌকাবিহার করিতে গিয়া দুইজনে সাক্ষাৎ হয়—তারপর সে এক মধ্যযুগীয় অত্যাশ্চর্য প্রণয় কাহিনী। কালক্রমে মহাকাল তাহাদের দুইটি জীবনের পটভূমি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

ষ্টেশনের নিকট আসিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ভারাক্রান্ত কণ্ঠে রামকুমারী কহিল, কোন্ হোটেলে উঠতে চাও, শেঠজী?

বলিলাম, না, কোনো হোটেলেই নয়, এবার আমি বিদায় নেবো, রামকুমারী।

লোভের বস্তু যে আমি ছাড়িয়া দিব তাহা সে ভাবে নাই; মাংসখণ্ডের প্রতি ব্যাঘ্রের আসক্তি নাই ইহাও

অপ্রত্যাশিত। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, থাকতে চাওনা দুদিন আমার সঙ্গে ?

বলিলাম, না, অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে।

পুরুষ হইয়া এমন অবহেলায় তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম, তাহাতে হয়ত তাহার অহমিকায় কিছু আঘাত লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু সে আর মুখ তুলিল না, নত-মুখেই কহিল, তোমার উপকার আমি চিরদিন মনে রাখবো, বিরিজলালজী।

বলিলাম, লালসার প্রেরণায় তোমার সঙ্গে আমি এসে-ছিলাম, উপকার করতে আসিনি। আমাকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই, বরং আমাকেই তুমি ক্ষমা ক'রো রামকুমারী।

তাহার চোখে পুনরায় উদ্গত অশ্রুর চিহ্ন দেখিলাম। কিন্তু সে আর জবাব দিলনা।

আমি লাহোর হইয়া কাল্কায় যাইব, সে দিল্লী হইয়া বোম্বাই যাইবে। তাহার গাড়ী আগে আসিল। আমি তাহার মালপত্র তুলিয়া তাহাকে ভালো জায়গা দেখাইয়া দিলাম।

কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয় সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, রামকুমারী আর কিছু না পারিয়া আমার দুইখানা হাত লইয়া সাষ্টাঙ্গে নত হইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল এবং তাহার পর আমি সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না—দ্রুতপদে লাহোরের ট্রেন অনুসন্ধান করিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

গদ্য-কবিতা

কানের দুল দুটো দুলে ওঠে কথা বলতে গিয়ে; অর্দ্ধ-সমাপ্ত আবদার রসগদগদ ভঙ্গীতে মুখের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

লীলা প্রথমে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরলে—আদরিনীরা যেমন পুরুষের স্নেহপ্রবণতার সুযোগে গ্রীবা দুলিয়ে অভিমান জানায়।

বললে, বেশ করেছি, খুব করেছি—

প্রণয়-প্রশ্রয়িনীদের অস্ত্র কণ্ঠে আর চোখের কোণে। তার রসঢালা অধরের দিকে চেয়ে হরিচরণ বললে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমা দেখা? কি সর্ব্বনাশ।

আবার দেখবো, ফের দেখবো।—এই ব'লে সভয়ে লীলা স্বামীর গলা ছেড়ে উঠে গেল এবং পিছন দিক থেকে তার পিঠের উপরে মুখ লুকিয়ে বললে, একি

আমার দোষ? নিয়ে যাওয়া কেন? কেন তুমি বাড়ী থাকো না?

হরিচরণ বললে, আচ্ছা বেশ, রোজ যেয়ো।

তার গলার আওয়াজটাই যথেষ্ট। পলকের মধ্যেই লীলার উত্তেজনা ক'মে আসে। সে ঘুরে এসে স্বামীর হাত দু'খানা টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়ায়। বলে,—তুমি বলোনি কেন যে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমায় যাওয়া অন্যায়।

এবং তারপরে, বলা বাহুল্য, স্বামীস্ত্রীর বিবাদ ওই-খানেই মিটমাট হয়ে যায়। মিটমাট না ক'রেই বা উপায় কি। আজ তিন বছর হোলো তাদের বিয়ে হয়েচে। লীলার বয়স পনেরো থেকে আঠারোয় এসে দাঁড়ালো, কিন্তু জ্ঞানমার্গে তার উন্নতি সুদূরপরাহত। সে ভালো ক'রে কাপড় পরতে শেখেনি, সাজতে জানে না, না জানে স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গী হ'তে। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ।

বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে মোতায়েন থাকা হরিচরণের পক্ষে সম্ভব নয়। তার অনেক কাজ। যন্ত্রপাতির কাজ কারবারে তার খাটুনি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তার কাজের কামাই নেই, অবকাশ বড় কম।

সে বললে, আজ আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি, কি কি করেছি শুনবে?

না আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না—এই ব'লে লীলা রাগ ক'রে বিছানায় গিয়ে উঠলো। স্বামী যাতে আর কিছুতেই তার মুখ দেখতে না পায় এজন্যে মুখের উপর মুড়ি দিয়ে সে শক্ত হ'য়ে শুয়ে রইল। আর একটুও বাক্যালাপ সে করবে না।

হরিচরণের রাগ হয় না। রাগ করবার যোগ্য স্ত্রী তার নয়। এই অর্বাচীন নির্বোধ মেয়েটিকে সে দীর্ঘ তিনবছর চালিয়ে নিয়ে এলো। তার স্নেহের প্রশ্রয়ের মধ্যে ওর কত চপলতা, কত কী অবাধ্যতা, তার সীমা নেই স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একটু হাসলো, আর কিছু বললে না।

আলোটার কাছে গিয়ে হরিচরণ তার জামার পকেট থেকে এক তাড়া কাগজপত্র বার করলে। আজ তার জমাখরচের হিসেব অনেক বেশি। এক টন্ সুরকির দাম ছ'টাকা সাড়ে পনেরো আনা। তিনশো একান্ন মন সুরকির দাম আজ রাত্রে তাকে ক'ষে বার করতেই হবে। কাল সকালে মুখার্জি কোম্পানীতে জয়েন্টের টাকা হিসেব ক'রে জমা দেওয়া চাই। ওদিকে সেই জয়রামপুর ফার্ম থেকে ড্রাফ্‌টসম্যান্ সেই জল পাম্প্ করার যন্ত্রটার ড্রইং পাঠিয়েছে, সেটা নিয়ে কাল বাজারে ঘোরা চাই,—বাস্তবিক, তার একটুও নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

একবার মুখ ফিরিয়ে সে ডাকলে, লীলা? শুনছ?

লীলা সাড়া দিল না।

হরিচরণ মিনতি ক'রে বললে, দীনু মিস্ত্রির কাগজ-গুলো সেই যে রাখতে দিয়েছিলুম তোমার কাছে—লক্ষ্মীটি, দাওনা, তার হিসেবটা আজ চুকিয়ে ফেলতেই হবে। ভারি তাগাদা দিচ্ছে। ও লীলা?

লীলা সাড়া দিল না, অতএব নিরুপায় হয়ে হরিচরণকে তিনশো একান্ন মন সুরকির মরুভূমিতে হাতড়ে চল্‌তে হোলো।

নিচে থেকে পিসিমা এক সময়ে খাবার জন্য ডাক দিলেন। ঠাকুর খাবার বেড়ে দিয়েছে। হরিচরণ কাগজ পত্র ছড়িয়ে রেখে উঠে নিচে চলে যায়। হিসেব-গুলো তার মাথার ভিতর ঘুরপাক খেতে থাকে।

আহারাদি সেরে উপরে উঠে এসে সে দেখলে, লীলা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। স্বামীর পক্ষে প্রশ্ন করা উচিত স্ত্রীর আহার হয়েছে কিনা। হরিচরণের সে কর্তব্য মনেই এলো না। রাত অনেক হয়েছে বৈ কি, বারোটা বাজে, চোখে তার ঘুমের আবেশ জড়িয়ে এসেছে। এখন আবার হিসাবপত্র নিয়ে বস্‌লে বাকি রাতটুকু পুইয়ে যাবে। কাল সকালে উঠেই তার নতুন বাড়ীর কাজের তদারকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। খাটুনি অনেক। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে ঘন হয়ে।

দরজাটা বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে হরিচরণ বিছানায় এসে উঠল। লীলা ঘুমিয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, তারই একান্তে অল্প একটুখানি জায়গা নিয়ে সেই নরম আর মধুর বিছানায় হরিচরণ কুণ্ঠিত-ভাবে শুয়ে পড়ে।

লীলা? ওগো—

লীলার সাড়া নেই। পরিশ্রম একটু হয়েছে বৈ কি। সিনেমায় যাওয়া আসা, সংসারের কাজে সারাদিন ছুটোছুটি,—স্ত্রীকে সে আর ডাকলে না। জান্‌লার বাইরে অন্ধ শ্রাবণের বর্ষণ মুখরতা অনেকক্ষণ থেকেই চলছে, পথের কোন্ প্রান্ত থেকে একটুখানি জলে-ভেজা পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে খাটের বাজুর উপর। শ্রাবণের একটা তৃষ্ণার্ত আত্মা বাইরে যেন বায়ুর বেগে নিশ্বাস ফেলে চলেছে। হরিচরণ স্থির হয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু আলো জ্বালা থাকলে দেখা যেতো তার পাশে যে মেয়েটি আপাদমস্তক আবৃত ক'রে নিঃশব্দে প'ড়ে রয়েছে তার আল্‌তা-পরা পা দুখানি একটি অপরটির গা ঘষছে—ঋতু সমাগমে হরিণ যেমন হরিণীর গাত্র লেহন করে। কাছে টেনে নেবার প্রতীক্ষায় নারী জেগে ছিল।

*
*

দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে? ওই যে আমাদের নতুন বাড়ী। চিড়িতনের ফোকর—মিঠে গোলাপী রং

মানিয়েছে দেওয়ালে,—ও কি, কি ভাবছো ?—হরিচরণ উৎসুক হয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালে।

চলন্ত মোটরে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে লীলা বললে, কিচ্ছু না।

হরিচরণ চোখের তারায় উল্লাসের ঝঙ্কার তুলে বললে, এমন প্ল্যানের বাড়ী কলকাতায় একটিও নেই, রবি ঠাকুরের শ্যামলীকেও হার মানায়! জান্‌লা দেখবে কচি কলাপাতা রং, ইঁট, চুণ, সুরকির একটা অদ্ভুত স্বপ্ন, বর্ণ পরিচয়ের অক্ষরগুলো একত্র ক'রে যেন একটা গীতিকবিতা।

আঃ—লীলা চোখ রাঙিয়ে উঠলো।—এক কথা একশো বার। যাবো না আমি তোমার সঙ্গে।

হরিচরণ যেন ফুৎকারে নিভে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে তাদের ট্যাক্‌সি নতুন বাড়ীর ধারে এসে থেমেছে।

দু'জনে নামতেই লোকজন ঘিরে এসে দাঁড়ালো। কেউ দালাল, কেউ মিস্ত্রী, কেউ সিমেণ্টওয়ালা। হরিচরণ বললে, বাড়ী ত প্রায় শেষ, আনলুম আমার স্ত্রীকে দেখাতে—বুঝলেন না, মেয়েদের চোখই আলাদা। পুরুষ মানুষ আর বাড়ীতে থাকে কতটুকু, বাড়ী ত মেয়েদেরই জন্যে। কাল আবার পিসিমাকে এনে দেখাবো। এসো, এই দিক দিয়ে—ইয়া, আরে, এ কি করেছেন সরকার মশাই, দালানের খিলেন খুলিয়েছেন?

জ'মে গেছে বুঝি? কাল রাতে যে বিষ্টি, ঘুমের ঘোরে ভাবলুম বুঝি চূণের ঘরে জল ঢুকছে!

মেঘের মতো মুখ ক'রে লীলা প্রায় সমস্ত বাড়ীটায় ঘুরে ঘুরে স্বামীর সঙ্গে দেখতে লাগলো। বাঁশ, কাঠ, চূণ, সুরকি, ইঁটের কুচি, দড়ি, করোগেটের টুক্‌রো—চারিদিক একাকার। রং আর ছুতোরের কাজ চলছে। নতুন কাঁচা রঙের গন্ধে ঘরগুলো ভরো ভরো। খুশিতে হরিচরণের মুখখানা আরক্ত আভায় অলঙ্কৃত। এখানে একটা নতুন জীবনের পত্তন হবে। এখানকার কুমারী মৃত্তিকায় পছন্দসই ফুলের বীজ বপন করা হবে। আগামী বসন্তে পুষ্প বীথিকা। হরিচরণের হৃদ্‌পিণ্ডটা রক্তের তরঙ্গে নাচতে লাগলো।

এদিকে এসো লীলা, এ বারান্দায় দাঁড়ালে সমস্ত শহর,—দূ—রে চেয়ে দেখো মনুমেণ্টের চূড়ো—সে ব'লে চললো, দক্ষিণ দিকে নতুন আকাশের টুক্‌রো। বাথরুম্ দেখবে এসো।

লীলা তার পিছনে পিছনে চললো মুখে রাশি পরিমাণ বিরক্তি নিয়ে।

ওহে মিস্ত্রী, ইটালিয়ান্ টাইল্‌স্ আসেনি বুঝি? বাথ্‌টাব্‌টা কাঁচের হবে মনে আছে ত? এইখানে ধারাযন্ত্র দেবো। অদ্ভুত গন্ধ ঘরটায়—না? এইটে সাবান তেল রাখার কুলুঙ্গী। জানালার ফ্রেমে হবে রঙীন কাঁচ, প্রায় কাঁচের ঘর। বাথ্‌রুমে গান গাইতে বেশ লাগে, জলের

শব্দে মিলে যায়।—হরিচরণ বললে, পছন্দ হয়েছে ত? হবেই জানা কথা।

লীলা বললে, ফিরে চলো এবার।

সে কি, আরো কত যে দেখবার আছে। দাঁড়াও, অনেক কাজ,—ওরা সবাই অপেক্ষা করছে; হিসেবটা সেরে দিই—ওহে সরকার মশাই—

না, ফিরে চলো, আর আমি একটুও থাকবো না—লীলার ঝোঁকটা বেড়েই চললো, একটুও ভালো লাগছে না, এক্ষুনি চলো।

বিস্মিত হয়ে হরিচরণ বললে, কী বলছ তুমি?

থাকতে আমি পাচ্ছিনে। লীলা চেঁচিয়ে উঠলো—থাকো তুমি, আমি চ'লে যাই।

একা যাবে কোথায় ট্যাক্‌সিতে? ছি, কী হ'লে তুমি?—হরিচরণ তার হাত চেপে ধরলো। লীলা মুখ তুলতেই দেখা গেল বড় বড় জলের ফোঁটা তার দুই চোখে ভ'রে উঠেছে।

নূতন সিঁড়ির ধারে সরকার মশায়ের পায়ের শব্দ হতেই হরিচরণ স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিলে। বললে, সরকার মশাই, আসছি আমি এখুনি এঁকে বাড়ী পৌছে দিয়ে—শরীর ত এঁর ভালো নয়। এসো।

স্বামীর পিছনে পিছনে নেমে এসে লীলা গাড়ীতে উঠলো। হরিচরণকে আবার এখুনি ফিরে আসতে হবে। জলের পাইপ কোথা দিয়ে আসবে দেখা দরকার।

পাচিল মাপের কাজে তাকে না হলেই চলবে না। বাড়ীর নর্দমাগুলোর পথ সে এসে বুঝিয়ে দেবে। সে না থাকলে সিমেণ্টের হিসেব হবে না; ছুতোররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে—সে এসে কাজের হিসেব নেবে। চলন্ত মোটরে স্থির হ'য়ে ব'সে হরিচরণ কাজের কথাই ভাবতে লাগলো।

লীলা একটু কাছে স'রে এলো। তার হাতের উপর হেলান দিয়ে মুখ তুলে বললে, আর তোমাকে আমি এখানে আসতে দেবো না।

মুখ ফিরিয়ে হরিচরণ বললে, কোথায়? নতুন বাড়ীতে!

হঁ্যা। তুমি আসতে পাবে না।—এই ব'লে লীলা তার উৎসুক চিক্কন অধর তুলে ধরলে।

আমি না এলে কাজকর্ম দেখবে কে?—হরিচরণ বললে, সিড়ির রেলিংগুলো তোমার কেমন লাগলো? বেশ নতুন ধরণের হয়েছে, নয়? জানো ছ'টাকা তের আনা ক'রে ওদের হন্দর। আজকাল ভারি আক্রা।

ব্যর্থ মুখ লীলা ফিরিয়ে নিলে। মোটর প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে। সোজা হয়ে বসে সে বললে, আজ তবে আমাকে নিয়ে চলো সেখানে?

কোথায়?

সেই যে খড়দার গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

বারে, বেশ মেয়ে ত' তুমি ?—হরিচরণ বললে, এটি বুঝি বেড়ানো হলো না ? তুমিও বেড়ালে, আমারও কাজ হোলো—এই ত' বেশ !

মুখখানা অন্ধকার ক'রে লীলা চুপ ক'রে রইলো।

সেদিন ফিরে এসে সমস্ত দিন হরিচরণ তার নিত্য-কর্মের জটিল জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। তার সমস্ত চিন্তা আর কল্পনার ধারা তার এই নতুন স্বষ্টির সঙ্গমে এসে মিলেছে। আর কোনদিকে তার মনের গতি ঘুরিয়ে দেবার অবসর নেই, এ যেন একটা ভয়ানক নেশা।

বাড়ী ফিরতে তার একটু বেশি রাত্রি হোলো বৈ কি, এত দেরি তার সহসা হয় না। স্নান ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে সে এসে খেতে বসলো। পিসিমা খাবার রেখে বসেছিলেন। আশেপাশে লীলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—সকালের সেই অজস্র অভিমান সে বোধ কারি ভুলতে পারেনি। কিন্তু অভিমান ভাঙ্গাবার সময় হরিচরণের নয়। সে মুখ বুজে খেতে লাগলো।

পিসিমা রুষ্ট মুখে হরিচরণকে বাতাস করতে করতে এক সময় বললেন, এত অবাধ্য হ'লে ত' সংসার চলে না, হরিচরণ।

কি হোলো, পিসিমা ?

বৌমার কথা বলছি। সারাদিন খেটেখুটে তুই বাড়ী এলি, আর সে নিজের মতে চ'লে গেল।

কোথায় সে?

সে বাড়ীতে নেই বাছা।

সে বাড়ীতে নেই! মানে?—হরিচরণ মুখ তুললে।

পিসিমা বললেন, সেই যে তুই রেখে গেলি, তার ঘণ্টাখানেক পরেই সে একলা চ'লে গেল, খেলে না, নাইলে না। জিজ্ঞেস করলুম, বৌমা, কোথায় যাচ্ছো গো। ব'লে গেল, দিদির বাড়ী? জানিনে বাছা এখনকার মেয়েদের কাণ্ড।

আহারাদি ক'রে হরিচরণ উপরে উঠে এলো। ঘরের মধ্যে একরাশ জামা কাপড় ছড়ানো। বোঝা গেল, সবচেয়ে যে শাড়ী আর জামা তার পছন্দ সেইগুলি প'রে সে গেছে। অন্যান্য জামা, কাপড়, আণ্ডারওয়ার, ব্লাউজ—সমস্তগুলি ঘরময় বিক্ষিপ্ত, ধূলিধূসরিত। সমস্ত ঘরটা সুগন্ধী দ্রব্য আর পাউডারের স্তিমিত গন্ধে ভরোভরো। হরিচরণ সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও সেগুলি একে একে পাট ক'রে সুবিন্যস্ত অবস্থায় আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখলো। তার ভয়ানক রাগ হোলো, কারণ এগুলি প্রয়োজন মতো খুঁজে না পেলে সেই অবুজ আর অনভিজ্ঞ মেয়েটি তার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।

কিন্তু রাত্রি দশটা বাজে। স্বামীকে ছেড়ে কোথাও থাকবার মেয়ে সে নয়। সিনেমায় আজ সে যায়নি। হরিচরণের বলিষ্ঠ হাতখানার উপর মাথা রেখে না শুলে সেই মেয়ের ঘুম হয় না। দিদির বাড়া সে কিছুতেই

থাকবে না, কারণ দিদির সঙ্গে তার এক তিল বনিবনা নেই। তবে রাত্রে সে কোথায় গেল?

অথচ আজ সময় নষ্ট করলে হরিচরণের চলবে না। সে গিয়ে বসলো টেবিলের ধারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে সে একাগ্র মনে সাঁতরে চললো। আজ তার হিসাবের সমস্ত কাজগুলো শেষ করা চাই; এবং এইভাবে রাত প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত সমস্ত পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে সে হিসাবপত্রের অথৈ নদী সাঁতরে কূলে এসে উঠলো— তখন তার দুই চক্ষু নিদ্রার রসে টলটল করছে। একবার সে অনুপস্থিত লীলার প্রতি তার অসীম বিরক্তি প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, টলতে টলতে বিছানায় উঠে দু'মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোলো।

অত রাত্রি জাগার পর সকালবেলা ঘুম ভাঙতে হরিচরণের একটু দেরি হোলো অবশ্য। আড়ামোড়া খেয়ে একটু আলস্যি ভাঙ্‌বার চেষ্টা করতেই সহসা সে চম্‌কে উঠলো। চোখ খুলে দেখলে লীলা তার পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার সেই ঘুমের মধ্যে, তার চোখ, মুখে ভ্রূরেখায় অকুণ্ঠ অসম্বৃত দেহবিস্তারে কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ অথবা উদ্বেগ নেই। রাত্রে কখন্ সে ফিরে এসেছে হরিচরণ কিছুই জানে না। রুক্ষ চুলের রাশির অন্ধকারে চাঁদপানা মুখে তার সোহাগভরা নিদ্রা—নিদ্রায় আলুথালু।

কিন্তু নিদ্রিতা নারীর রূপমাধুরী নিঃশব্দে পান করার আগ্রহ হরিচরণের ছিল না। সে কঠিন কণ্ঠে বললে, পোড়ারমুখি, কাল সারাদিন কোথায় ছিলে শুনি?

লীলা জেগে উঠিলো। রাত্রি জাগরণে রাঙা দুই হরিণীনয়ন। কিন্তু সে পলকের জন্য। তারপরই সে অতিশয় বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার দিব্যি ঘুমোতে লাগলো।

হরিচরণ বললে, অমনি ক'রে চটকাচ্ছো, ভালো কাপড় জামাগুলো নষ্ট হয়ে গেল যে?

কিন্তু স্ত্রীর সাড়া পাওয়া গেল না। এর পরে হরিচরণ রাগ করবে কার উপর? অগত্যা বিছানা থেকে নেমে সে বাইরে গিয়ে ডাক দিলে, ঠাকুর চা দিয়ে যাও।

ঠাকুর চা আনবার আগে সে ঘরে এসে একবার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে গায়ের কাপড় টেনে টেনে ঢাকা দিলে। বললে, এমন বেপরোয়া ঘুম কোথায় শিখলে শুনি? নাও, ওঠো, ঠাকুর চা আনছে।

ক্লান্ত দেহে লীলা এবার উঠে বসলো। হরিচরণ প্রশ্ন করলে, কাল কোথায় ছিলে? রাত্রে ফিরলে কখন্?

সাড়ে তিনটের সময়।—লীলা বললে।

হরিচরণ বললে, একা?

না, জামাইবাবুর ছোট ভাই ছিল সঙ্গে।

কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

আঃ—লীলা বিরক্ত হয়ে বললে, বলছি যে ডায়মণ্ড-হারবার গিয়েছিলুম বেড়াতে?

কই, একবারো বলোনি।

আচ্ছা বলিনি, হোলো?

হরিচরণ বললে, সেখানে গিয়ে কি করলে?

সেখানে?—লীলা এবার ফিক ক'রে হেসে ফেললে, দোল্‌না আছে, তাইতে দুলছিলুম দুজনে। জানো জামাইবাবুর ছোট ভায়ের গায়ে কী জোর। উঃ আমাকে যা দোলা দিতে লাগলো। আমিও খুব ক'রে তার দোল্‌না ঠেলছিলুম।

আর কে গিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে?—হরিচরণ প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তর দেবার আগে ঠাকুর দু'পেয়ালা চা এনে হাজির করলে।

মুখ ধুয়ে এসে লীলা গুছিয়ে বসলো। চায়ের পেয়ালা হাতের কাছে টেনে নিয়ে দীর্ঘ একটা ভূমিকা ক'রে তার গতদিনের ভ্রমণকাহিনী আনুপূর্ব্বিক আরম্ভ করলে। তার দিদির দেবর কেমন ভালো ছেলে, কেমন তার সুন্দর চেহারা, কতখানি গায়ে জোর,—এই দিয়ে তার কাহিনী সুরু। তারা দু'জনে সারাদিন মোটর চ'ড়ে বেড়িয়েছে, আউটরাম ঘাটের হোটেলে চা খেয়েছে, খিদির-পুরে ডক দেখেছে, তারপর গেছে ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে চড়িভাতি ক'রে আহার সাঙ্গ করতেই প্রায় রাত বারোটা হয়ে গেল। জামাইবাবুর ছোট

ভায়ের মতন এমন মধুর স্বভাবের যুবক সে আর দেখেনি।

তারপর?—হরিচরণ প্রশ্ন করলে।

তারপর আমাকে নীরেন এসে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল!

বিদায় সম্ভাষণটা কেমন হোলো?

ক্ষণেকের জন্য লীলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর উঠে গিয়ে তার পিঠের উপর মুখ খানা ঘ'ষে বললে, তুমি বুঝি রাগ করলে? রাগ করবে জানলে আমি—

নীরেন কী বললে শুনি?

বলব না আমি, যাও।

শিগগির বলো বলছি? হরিচরণ ধমক দিলে কৃত্রিম কণ্ঠে।

স্বামীর মুখের উপর হাতখানা বুলিয়ে লীলা বললে, আমাকে দেখতে খুব ভালো, তাই বললে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা কথা রাখবে বলো?

কি কথা?

আগে বলো রাখবে কি না?

হরিচরণ বললে, রাখবার মতন যদি হয়—

খুব রাখবার মতন।—লীলা আদর-জড়িত কণ্ঠে বললে, কিছু টাকা আমাকে দাও।

টাকা? কেন বলো ত?

নীরেনকে আমি দেবো। তার কিছু হাতখরচ নেই, তা জানো ?

হরিচরণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ ক'রে রইলো। লীলা পুনরায় বললে, কাল আবার নীরেন আসবে,—আমরা কিন্তু কাল আর্ট একজিবিশন্ দেখতে যাবো, তা ব'লে রাখছি। বেশি না, দশ টাকা দিয়ো লক্ষ্মীটি,—কেমন ?

নিচে থেকে কে যেন বাইরের লোক হরিচরণকে ডাক দিলে। সে ওঠবার চেষ্টা করতেই লীলা তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, কিছুতেই শুনবো না আমি। বলো দেবে ?

রাগ ক'রে হরিচরণ বললে, আমি টাকা দেবো আর সেই টাকা নিয়ে তুমি—

আমি যে কথা দিয়েছি নীরেনকে।

পরপুরুষের সঙ্গে তুমি বেড়িয়ে বেড়াতে চাও ?

সরল সহজ দৃষ্টিতে লীলা স্বামীর দিকে তাকালো। অবাক হয়ে বললে, পর কেন হবে ? সে ত জামাইবাবুর ভাই ?

নিচে থেকে আবার ডাক এলো। ব্যস্ত হয়ে হরিচরণ বললে, আচ্ছা, আজ ত' আর নয়। সাবধান, কাগজপত্র ছড়ানো রইলো, যেন হাত দিয়ো না। আসছি আমি। —এই ব'লে সে জামাটা গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। গেল বটে কিন্তু সে-বেলায় হরিচরণ আর ফিরে এলো

না। ইটওয়ালার পাল্লায় প'ড়ে সারাটা দিন মিস্ত্রি-মজুরদের আন্দোলনে সে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে রইলো। স্ত্রীর কথা সে ভুলেই গেল।

রাগে দুঃখে অভিমানে লীলা সমস্ত দিন বিষধর সর্পিনীর মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তারপর এক সময় নিরুপায় হয়ে সে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলে। পিসিমা এসে ডাকাডাকি করলেন কিন্তু সে কিছুতেই সাড়া দিল না। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে প'ড়ে রইল।

হরিচরণ যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা সাতটা। পিসিমা তীব্রকণ্ঠে সমস্ত ঘটনা তার কাছে বিবৃত করলেন। অনেকদিন পরে আজ সহসা হরিচরণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো রাগে অন্ধ হয়ে সে উপরে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে, খোলো শিগ্‌গির দরজা।

স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তখনই লীলা দরজা খুলে দিলে। হরিচরণ ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো, তারপর বললে: কেন তোমার এই স্বেচ্ছাচার দিন দিন ?

হাসিমুখে লীলা বললে, কেমন জব্দ ?

তোমার এই হিষ্টিরিয়ার ভূত আমি ছাড়াতে জানি, তা জানো ?—বলতে বলতেই হরিচরণের দৃষ্টি পড়লো ঘরের এক কোনে। সচকিত হয়ে সে বললে, ঘরের মধ্যে অত কাগজের ছাই কেন ?

লীলা রাগ ক'রে বললে, তোমার সব কাগজপত্র আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

অ্যাঁ?—এই ব'লে হরিচরণ সেই ছাইগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে, সর্ব্বনাশি, বাড়ীর সব কাগজপত্র আর হিসেবের যা কিছু এর মধ্যে,—কী করলে তুমি?—হতাশ হয়ে ব'সে প'ড়ে সে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

লীলা তার কাছে স'রে এলো। তারপর স্বামীর গায়ের উপর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সহজ সুরে বললে, বেশ করেছি। কেন তখন এই আসছি ব'লে চলে গেলে? কেন এলে না সারাদিন? খুব করেছি, বেশ করেছি—এই ব'লে সে হরিচরণের জামাটা খুলে দিতে লাগলে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে।

অপূরণীয় ক্ষতিতে সর্ব্বস্বান্ত হরিচরণ সহসা স্বভাব বিরুদ্ধ উত্তেজনায় এক সময় স্ত্রীকে আক্রমণ করলে। তার চুলের মুঠি ধ'রে পাকিয়ে রোষ-কষায়িত চক্ষে রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললে, হতভাগি, কেন এই সর্ব্বনাশ করলি?

কিন্তু লীলা আধুনিক মেয়ে নয়। শান্তভাবে সে তার দুই নিটোল নগ্নবাহু ছড়িয়ে স্বামীকে ঘিরে ধরলো। তারপর একটি অতি উচ্চমার্গের দার্শনিক বক্তৃতা কেঁদে বললে, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য দিকে মন দাও কেন? কেন তোমার চোখ থাকে বাইরের দিকে? কেন তোমার ঝোঁক ইঁটপাটকেলের ওপর?

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে হরিচরণ বললে, তবে কী চাস তুই ?

অশ্রু টলোটালো চক্ষে লীলা হাসলো ; তারপর জোর ক'রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সিঁদুর-মাখানো মাথা বুকের কাছে ঘ'ষে গলার কাছটা লালাসিক্ত ক'রে দিয়ে রসগদ-গদ কণ্ঠে বললে, আমি চাই তোমাকে।

নাটকীয়

শাড়ীর আঁচলটা কাঁধের উপর দিকে ফিরিয়ে বড় আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বললেন, মেয়েমানুষের সরলতায় আমি বিশ্বাস করিনে, অপরপক্ষকে মোহগ্রস্ত করবার এটা একটা অস্ত্র—

পাউডারের কৌটো খুলে তুলিটা নিয়ে তিনি গলায় আর ঘাড়ে একটু আমেজ বুলিয়ে নিলেন। চিরুণীটা একবার টেনে দিলেন সিঁথির দু'পাশে। চিকচিকে বিছাহার ছড়াটা গ্রীবার পাশ দিয়ে গলার দিকে এসে ব্লাউসের ভিতরে নেমে গেছে। তিব্বতী পাথরের দুল দুই কানে। চেহারাটা সুন্দর,—বয়সটা এখনও খুব অল্প দেখায়।

—আমি বিয়ে করিনি কেন বলতে পারো? জীবনটা আমিও কাটিয়ে দিতে পারতুম সচ্ছন্দে···স্বামী, সংসার

সন্তান, ঐশ্বর্য্য,—যা কিছু আমাদের কাম্য। তবু মাষ্টারি ক'রেই চিরটাকাল কাটিয়ে দিলুম—

সুমিত্রা আবার আয়নার ভিতরে তাকালেন নিজের দিকে। তারপর পুনরায় বললেন, তিরস্কার তোমাকে আমি করব না, সুধীরা,—উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে তুমি, আমার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখে তুমি পাশ করবে, তোমার সব খরচ আমি বহন করব এই ছিল আমার আশা,—কিন্তু এই কি তোমার আচরণ? স্পষ্ট ক'রে উত্তর দাও।

একটি কুরূপা মোটাসোটা মেয়ে ঘরের একান্তে একখানা বই হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ব'সেছিল, কিন্তু ব'সে থাকলেও তার দুই গাল বেয়ে চোখের জলও নেমে এসেছিল নিঃশব্দে। উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখের কথা থতিয়ে গেল।

সুমিত্রা একবার অপাঙ্গে সেই দিকে তাকালেন। অধর একটু ন'ড়ে উঠলো, কিন্তু সে-বোধহয় তীক্ষ্ণ একটি হাসির রেখা চেপে যাবার জন্য। চোখের জলের আন্তরিকতায় তাঁর বিশ্বাস নেই। তাঁর এই প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের ভিতরে অনেকের অশ্রু দেখতে পাওয়া গেছে। অশ্রুতে তাঁর মন বিগলিত হয় না। মেয়েদের অশ্রুর পিছনে থাকে কার্য্যোদ্ধারের ব্যাকুল প্রত্যাশা। তিনি বিশ্বাস করেন না।

বিকৃতমুখে বললেন, দিন-দিন তোমার মাথাটার যে

দশা হয়ে উঠলো, দেখলে আমারই লজ্জা করে—চুল আর নেই বললেই হয়, যে কগাছা আছে তাও শোনদড়ি। রূপ সকলের থাকেনা,—সুমিত্রা আয়নার ভিতরে চেয়ে বল্‌লেন,—যদিও রূপটাই মেয়েদের বড় পুঁজি,—কিন্তু নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখবেনা কেন? তোমাকে নিয়ে ভদ্রসমাজে আমি যেতেই পারিনে, তা জানো, সুধীরা?

এতক্ষণ পরে সেই রূপহীনা মেয়েটি বই থেকে মুখ তুলে তার দুইটি দীর্ঘায়ত চোখ মেলে তাকালো। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমি মনে করতুম—

কী মনে করতে তুমি? কথা বেরোয় না কেন?

আপনি সাজগোজ পছন্দ করেন না, তাই মনে করতুম।

এ বাড়ীর আশপাশে দু' একজন প্রতিবেশী আছেন। তারা না শুনতে পান্, সেজন্য চাপা ঝঙ্কার তুলে সুমিত্রা বললেন, সাজগোজ পছন্দ করিনে, আর লুকিয়ে লুকিয়ে পুরুষের সঙ্গে চিঠি চালাচালি বুঝি আমার খুব পছন্দ সই? ন্যাকামি আর ক'রোনা, সুধীরা! ছ' মাস এখনো হয়নি, এর মধ্যে বিজনকে নিয়ে তুমি এই কেলেঙ্কারীটা করলে। তুমি জানো, বিজন ইঞ্জিনীয়রের চাকুরিটা নিয়ে এই মোরাদাবাদে এসেছিল আমারই সাহায্যে? চাকুরির সন্ধান আমিই তাকে দিয়েছিলুম?

সুধীরা একবার মুখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। কিন্তু ওই একটি মুহূর্তেই সে দেখে নিল, সুমিত্রার হিংস্র

চক্ষু দপ দপ ক'রে জ্বলছে। উত্তর প্রত্যুত্তর করতে তার সাহস হোলো না।

—আমার সমস্ত বিশ্বাস তোমরা নষ্ট ক'রে দিয়েছ—সুমিত্রা বলতে লাগলেন, এই দূর দেশে তোমাকে কেউ দেখবার নেই, মা বাপ মরা মেয়ে তুমি, টাকা পয়সার জোর নেই, এখনও একটাও পাশ করোনি, একজনের আশ্রয়ে আশ্রিত,—কিন্তু তুমি আমার সব বিশ্বাস নষ্ট করলে। এজন্যই কি বিজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম? স্বাধীনতা পেয়েছিলে ব'লেই কি উচ্ছৃঙ্খল হ'তে হবে? তোমাদের দু'জনের চিঠিই আমি রেখে দিলুম, কিন্তু এই শেষবার জানিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে এসব চলবে না। এই ব'লে তিনি ছোট ছাতাটা হাতে নিয়ে পায়ে জুতোটা পরলেন। আর তাঁর অপেক্ষা করার সময় নেই, ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে।

সুধীরা উঠে এলো, এবং তাঁর পায়ের কাছে হেঁট হয়ে হাত বাড়াতেই সুমিত্রা একটু স'রে গেলেন। বললেন, থাক্, জুতোর ফিতে আজ থেকে আমিই বেঁধে নিতে পারবো। এ দিয়ে আমার মন আর ভোলাতে চেয়ো না, সুধীরা।

জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিয়ে তিনি ঘর থেকে মস মস ক'রে বেরিয়ে গেলেন। সুধীরা ভীতদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। তিনি বি-এ, বি-টি, তিনি সুন্দরী,—অহঙ্কার তাঁকে অলঙ্কারের মতই মানায়। নিজের

জীবনকে তিনি নিজের হাতেই গড়েছেন। পরাশ্রিতা, মুখ-চাওয়া মেয়ে তিনি নন্। তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত সুধীরা চেয়ে রইলো।

বাইরে এসে তিনি সোনার ছোট হাত ঘড়িতে দেখলেন, দশটা বেজে পঁচিশ। হাতে সময় নেই, যেতেও হবে অনেকটা পথ। বাড়ী এসেছিল একটু আগে, কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাগে তখনও তাঁর শরীর কাঁপছে বটে, কিন্তু মেয়েটাকে তিরস্কার ক'রেও প্রাণের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সম্মুখে পথের দিকে বহুদূরে ধূলিধূসর মাঠ, সেখানে ছায়াহীন রৌদ্র যেন তাঁরই জীবনের মতো ধুধু করছে।

মাঠের পারে কবেকার কোন্ নবাবী আমলের একটা প্রাসাদের শেষ ভগ্নাবশেষ। সেইদিকে চেয়ে তিনি মনে মনে হিসাব করলেন, সুধীরার আঠারো, আর তাঁর প্রায় একত্রিশ অর্থাৎ তেরো বছর বয়সে তাঁর সন্তান হ'লে সে হোতো সুধীরার মতো। তাঁর যৌবনকাল প্রায় অন্তিমে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন কথায় কথায় তাঁর বুকের ভিতরটায় একটি বাৎসল্যের কণ্ঠক টনটন করে, অনেক সময় তাঁর স্নেহের দৃষ্টি কেমন যেন নত হয়ে চলে।

ধীরে ধীরে তিনি পথে চলতে লাগলেন। সুধীরার মুখখানাও যেন তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। মেয়েটা অবশ্যই এতক্ষণে কাঁদতে বসেছে। আজ ছ'মাস ধ'রে তাঁর প্রতি এই মেয়েটির সেবার অন্ত নেই। তাঁকে গল্প

প'ড়ে শোনানো, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া, তাঁর টেবল্ গুছিয়ে রাখা, কাপড় জামার তদ্বির করা, মনের মতো আহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, রাত্রে তাঁর পায়ের সেবা ক'রে ঘুম পাড়ানো—মেয়েটা যেন তাঁর গায়ের পোকা। অন্যায় সে অবশ্যই করেছে; তবে, যুবতী মেয়ের কাছে প্রণয়লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে,—এও ত' নিত্যনৈমিত্তিক! ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা, এতে ত' পৃথিবীর সর্বনাশ হয়নি, সমাজও উচ্ছন্নে যায়নি! তবে কি এই অশান্তি কেবল তাঁরই মনে মনে?

দূরে একটা শুক্‌নো বিলের বাঁক পেরিয়ে যে-এক্কা গাড়ীটি দেখা গিয়েছিল, মাঠের পথ অতিক্রম ক'রে সেটি যে তাঁরই কাছাকাছি এসে পড়েছে, এতক্ষণ তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। গাড়ীখানা তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো।

—আপনার যে আজ এত বেলা হোলো, মিস্ বোস?

সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। মাথার টুপিটা খুলে বিজন পুনরায় বললে, আজ হেঁটে কেন?

সুমিত্রা বললে, হাঁটতে বেশ লাগছে।

মিছে কথা—বিজন হাসিমুখে বললে, ভুই পায়ে ধুলো মেখে কোনো হেড-মিস্ট্রেসেরই এত রোদে হাঁটতে ভালো লাগে না। আসুন, আপনাকে মাথায় ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুসলমান এক্কাওয়ালা বাঙ্গলা ভাষা বোঝেনা, তাই

রক্ষে। সুমিত্রা একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, আজ আমার মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? ফন্দীটা কিসের শুনি?

হো-হো ক'রে বিজন মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। বললে, পাণ্ডাকে খুশি না রাখলে ঠাকুর দর্শন হয়না যে।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা মিলিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু তার শেষ রেশটুকু অতি কষ্টে রৌদ্রক্লিষ্ট মুখ-খানার উপরে জাগিয়ে রেখে তিনি বললেন, আপনার গাড়ীতে আমাকে ইস্কুল পৌছে দিন্।

আসুন আসুন, আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু উঠবো কি ক'রে?

আমার হাত ধ'রে?

সুমিত্রা হেসে বললেন, ফেলে দেবেন না ত'?

ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়ে বিজন বললে, ধরতে জানলে পড়বেন না, ভয় নেই।

একাগাড়ী চ'ড়ে বিজনের মতো ছেলের সঙ্গে ইস্কুলে গিয়ে পৌছনয় একটু চক্ষুলজ্জা আছে বৈ কি। গাড়ীতে চ'ড়ে বসবার পর সুমিত্রার এই কথাটা মনে হোলো! কিন্তু গাড়ী ছুটতেই লাগলো, তাঁর সঙ্কোচের কথা বলাই হোলো না। কিছুদূর গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন কোথায় যাচ্ছিলেন এদিকে?

একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুম্। পশ্চিমের মাঠের

রোদটা বেশ লাগে। দিল্লী থেকে একটা সিনেমাপার্টি এসেছে, তারা ছাউনি বাঁধবে কোথায় তাই দেখতে যাচ্ছিলুম।

সুমিত্রা বললেন, এত বানিয়েও বলতে পারেন আপনারা।

বিজন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, কেন ?

ধমক দিয়ে সুমিত্রা বললেন আপনি যাচ্ছিলেন আমার ওখানে। আপনি জানতেন এই সময় আমি থাকিনে।

বিজন চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, হয়ত আসবার সময় সুধীরার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতুম। কিন্তু আপনি আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন।

বাড়াবাড়ি আপনারা করছেন না ?

বিজন বললে না, সুধীরাকে আমি একটু ভালো-বেসেছি এইমাত্র।

কণ্ঠে একঝলক উত্তাপ প্রকাশ ক'রে সুমিত্রা বললেন, এটা যে লজ্জা আর কলঙ্কের কথা তা আপনি স্বীকার করেন ?

না, মিস্ বোস।

ও। ব'লে সুমিত্রা চুপ ক'রে গেলেন। গাড়ী উঁচু-নীচু পথে হেলে-দুলে ছুটে চলছিল। যে-পথটা চৌক-এর দিকে গেছে, সেই দিকে গাড়ী বাঁক নিতেই তিনি নিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন, থাক, আজ ইস্কুলে আমি যাবো না।

বিজন মুখ ফিরিয়ে বললে, যাবেন না? তাহ'লে?

গাড়ীতেই থাকবো কিছুক্ষণ। অন্য পথে চলুন।

সে কি? কোথায় যেতে চান্?

রাগ ক'রে সুমিত্রা বললেন, চুলোয়।

বিজন এক্কাকে আবার মাঠের পথের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলে। পরে হেসে বললে, চুলোয় নিয়ে যেতে পারি সুধীরাকে, আপনাকে নয়।

সুমিত্রা বললেন, আচ্ছা, পুরুষ মানুষরা কি বুড়ো হয়না? তিরিশ বছরেও তারা ছেলে মানুষ থাকে?

হাসিমুখে বিজন বললে, যারা বারোয় পাকে তারা বত্রিশে বুড়ো হয়, আর যারা পঁচিশে পাকে তারা বুড়ো হয় পঞ্চাশে।

আপনি কেন চিঠি লিখেছেন সুধীরাকে?

চিঠি লিখিনি, লিখেছি প্রেমপত্র।

লজ্জা করেনা আপনার?

আপনার কাছে আবার লজ্জা কিসের?

সুমিত্রা বললেন, আপনি জানেন যে, আপনাকে আমি বিশ্বাস করিনে!

বিজন বললে, খুবই স্বাভাবিক। লেখা-পড়া শিখলে বুড়ি কুমারীরা পুরুষকে ঘৃণা করতে শেখে।

সুধীরা আমার আশ্রিত, সেকথাও আপনি মনে রাখবেন।

সেজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ? অনেক কথা আজকাল বলতে শিখেছেন। কেমন? বেশ, আমার বাড়ীতে আপনি আর কোনোদিন যাবেন না।—ব'লে সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর সর্বশরীর ভীষণ উত্তেজনায় কাঁপছিল। তিনি কঠোর ভাবে চোখের জল চেপে রইলেন। এমন অপমানজনক কথা তিনি কোনোদিন কায়োকে বলেননি।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে বিজন ধরালো। বা'র দুই জোরে টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে' কি বললেন?

সুমিত্রা উত্তর দিলেন না। গাড়ীখানা ছুটতে ছুটতেই চলতে লাগলো। অনেকদূর গিয়ে পকেট থেকে একটি চকোলেট বা'র করে বিজন মুখে পুরলো। তারপর সিগারেটে আর একটা টান্ দিয়ে বললে, বেশ, মনে রাখবো। এই কথা মনে রাখবো যে আপনি নিষেধ করেছেন আপনার বাড়ী যেতে।

সুমিত্রা বললেন, না, সেকথা আমি বলিনি। আমি বলেছি, সুধীরার সঙ্গে আপনার এই সম্পর্ক আমি স্বীকার করব না।

হেতু?

এটা অন্যায়, এটা অসম্ভব।

হেতু?

সুমিত্রা বললেন, কুমারী মেয়ের মন ভুল পথে গেলে তার জীবনে আর কোনো উন্নতি হয় না।

বিজন প্রশ্ন করলে, এই আপনার ধারণা?

এই আমার বিশ্বাস।

ও। আপনি কি উন্নতি করেছেন শুনি?

উত্তরটা সুমিত্রার মুখে থতিয়ে গেল। পথের ধারে ধূলিধূগর ফণীমনসা আর বাব্‌লার সারির দিকে চেয়ে নিজের জীবনের চেহারাটা তাঁর নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট মনে হোলো না। মাসে মাসে প্রায় দেড়শো টাকা তিনি এই প্রবাস-জীবনে থেকে উপার্জন করেন! ব্যাঙ্কে এরই মধ্যে তিনি হাজার পাঁচেক টাকা জমিয়েছেন। অলঙ্কার কিছু আছে। এসব ছাড়া চাকরানী দাই, গৃহসজ্জা, নামডাক, রংবেরঙের কয়েকখানা শাড়ী, কয়েক-জোড়া জুতো, দামী একটা গ্রামোফোন,—এবং বি-এ, বি-টি উপাধি। সমস্ত মিলিয়ে দেখলে উন্নতি তার কম নয়। কিন্তু তবু বিজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই সব নানাবিধ ঐশ্বর্যের বিশেষ কোনো অর্থ পাওয়া গেলনা, এই প্রিয়দর্শন যুবকের কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন পরিহাসের কাছে তার সমস্ত সম্পদ একটি মুহূর্তেই যেন ম্লান হয়ে এলো। উত্তর দিতে তাঁর সাহস হোলো না।

অনেকক্ষণ পরে হেসে বিজন বললে, অবশ্য আপনার বাড়ীতে আর বোধহয় আমাকে যেতেও হবেনা—কারণ—

স্তব্ধ হয়ে সুমিত্রা চলন্ত গাড়ীর একটা খুটি ধ'রে ব'সে ছিলেন। সিগারেটের শেষ অংশটা ফেলে দিয়ে বিজন বললে, আসামের এক ওয়াটার-ওয়ার্কসে বড় চাকুরির

জন্যে একটা দরখাস্ত করেছিলুম, তারা ডেকেছে। ছুটি নিয়ে আমি কল্‌কাতায় যাচ্ছি।

চকিত দৃষ্টিতে সুমিত্রা তার দিকে তাকালেন। উদ্বেগ চাপতে পারলেন না, ভীত চক্ষে চাপাস্বরে বললেন, কবে?

আজ রাত্রেই যাবার ইচ্ছে।—এই যে, আপনার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি, এবার নামুন।

গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চলুন, আমি নামবো না।—এই ব'লে সুমিত্রা দৃঢ় হয়ে চেপে ব'সে রইলেন। সুতরাং গাড়ী আবার চললো অন্য পথে। উপরের বারান্দায় সুধীরা যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তাদের নিশ্চয় দেখেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় সুমিত্রার ছিলনা।

আজ রাত্রে আপনি কল্‌কাতায় যাবেন, কই আগে বলেননি কেন?

বিজন বললে, সুধীরা আপনাকে বলেননি?

সুধীরা!—সুমিত্রা বললেন, সুধীরা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আপনার সংবাদ দেবে আর তাই আমাকে শুনতে হবে?

পরিষ্কার সহজ গলায় বিজন বললে, তাকেও যে নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।

কি বললেন?

শ্রীমতী সুধীরা দেবী আমার সহযাত্রী হবেন।

এ কথা কে বলেছে আপনাকে?

বিজন বললে, আমিই বলেছি, আমারই ব্যবস্থা।

আমি যদি যেতে না দিই ?—সুমিত্রা বললেন।

যেতে না দিলে সাবালক এবং সাবলিকা নিজেদের পায়ে হেঁটেই যাবে। প্রয়োজন হ'লে মহামান্য রাজ-সরকার বাহাদুর সাহায্য করবেন।

সুমিত্রা হাঁক দিলেন এই গাড়োয়ান, এক্কা ঘুমালেও এক্কা থামলো। বিজন বললে, বাড়ী যেতে চান ?

হ্যাঁ।

গাড়ী ঘুরে আবার বাসার দিকে চললো। সুমিত্রা কঠোর কণ্ঠে বললেন, আমি আপনার সামনেই সুধীরাকে জিজ্ঞেস করব, সে আমাকে এমন অপযশের মধ্যে ডুবিয়ে যাচ্ছে কেন।

বিজন বললে, সে কাঁদবে কিন্তু আপনার প্রশ্নের জবাব দেবে না।

তিক্তকণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, মেয়েমানুষের কান্না! তাদের কান্নার পেছনেও থাকে হীন ষড়যন্ত্র। চোখে তারও জল আসতে চাইলো, কিন্তু তিনি দমন করলেন।

বিজন বললে, ষড়যন্ত্র একা হয়না মিস্ বোস, আমিও তার মধ্যে আছি।

যে জ্বালাটা সুমিত্রা এতক্ষণ চেপে ছিলেন, সেটি এবার ফস করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুখের একটা শব্দ করে বললেন, যেমন তার কদাকার রূপ, তেমনি আপনার কদর্য্য রুচি।

বিজন হো হো শব্দে হেসে উঠলো। গাড়ী এসে সুমিত্রার বাসার কাছে দাঁড়ালো। দুজনে নেমে এলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিজন বললে, ভেতরে আমি যাবো না, এই গাড়ীতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনি সুধীরাকে ডাকুন এইখানে।

করুণ চক্ষে চেয়ে সুমিত্রা বললেন, যাবার দিনে আমাকে এইভাবে অপমান করে যেতে চান?

অপমান ত' করিনি, আপনার নিষেধ অনুসারেই আপনার বাড়ীতে ঢুকবো না।

কিন্তু এই বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে নিরুপায় মেয়েমানুষ কখন যে আপন অবচেতনাতেই নিজের পথটা খুঁজে নিয়েছে তা বলা কঠিন। এই যৌবনপ্রান্তবর্তিনী নারী সহসা আপনার সমস্ত অহমিকা ভুলে গিয়ে সহসা কাছে, এসে স্খলিতকণ্ঠে বললে, গাড়োয়ানের সামনে আমাকে পায়ে ধরাবেন?

বিজন একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো, তারপর এগিয়ে গিয়ে গাড়োয়ানকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করে এসে বললে, চলুন।

বেলা মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ। সুধীরার কোনো সাড়াশব্দই নেই। চাক্‌রাণী চলে গেছে. দাই বোধ করি কোথায় ঘুমিয়ে আছে। এই হিন্দুস্থানী প্ল্যানের বাসার নীচের পথটা অন্ধকার। সেই যাতায়াতের পথটা দিয়ে পার হবার-সময় সুমিত্রা সহসা বিজনের হাতখানা ধরলেন।

বললেন কেন ছেলেমানুষী করছেন? আমি নিয়ে যেতে দেবো না সুধীরাকে।

বিজন বললে, সত্যি বল্‌ব আপনাকে? ওঁকে না নিয়ে গেলেই আমার চলবে না।

আমি যদি সমস্ত বাঙ্গালীদের জড়ো করে আপনার এই অনাচারের কথা বলি?

তাতে কি আপনার নিজের কথাও ঢাকা থাকবে?

কি বলছেন?

বিজন বললে, এত অত্যাচার আপনি এই কয়মাস ধরে আরম্ভ করেছেন যে, এর একমাত্র জবাব সুধীরাকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যাওয়া। মিস্ বোস, আমার প্রতি আপনার যত স্নেহই থাকুক, আপনি বিকৃত আদর্শের দোহাই দিয়ে বহু মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন।

চাপাগলায় সুমিত্রা বললেন, তার মানে?

তার মানে, তথাকথিত স্বাধীনতার নাম করে আপনি মেয়েদের স্বভাবধর্ম বিষাক্ত করতে চান। আপনার কাছে থেকে তারা সংযম শেখে বটে কিন্তু সংশিক্ষা হারায়।

সুমিত্রার গলা কেঁপে উঠলো। বললে, সব আমি মানলুম, কিন্তু আপনি চলে যাবেন কেন দেশ ছেড়ে?

উত্তেজিত হয়ে বিজন বললে, আপনার নাগপাশ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই, সুধীরাকেও বাঁচাতে চাই।

কম্পিত অধীর কণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, ভগবান যাকে কোনো কিছুই দেননি তার কাছে আপনি এমন কী ঐশ্বর্য পেলেন যাকে নিয়ে সব ছেড়ে যেতেও আপনি প্রস্তুত?

পুরুষ না হলে সেকথা বলা যায় না, মিস্ বোস।

এ বাড়ীতে কি আপনার জন্যে কিছুই ছিল না? সুধীরা আপনার কে? সুমিত্রার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কণ্ঠনালীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে এলো।

বিজন একটু থেমে বললে, উনি যেই হোন্, আর যেমনই হোন, আমি ওঁকে বিয়ে করব। বিদেশে যাবার সময় উনি আমার সঙ্গে যাবেন। আপনি যদি না ছেড়ে দেন, জোর করে নিয়ে যাবো। এই আমার শেষ কথা।

কিন্তু এর পরেও যেকথা ছিল তা বিজন ভেবে দেখেনি। ভগবান যাকে কিছু দেন নি সে অনেক সময় ঐশ্বর্য পায় বটে কিন্তু সব থেকেও যার কিছু নেই, সে আশ্রয় পাবে কোন আঘাটায়? পুরুষের বিচার কি তাদের পরে এতই অকরুণ?

চোখের জলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সহসা সেই গলিপথের ধারে নিরুপায় সেই বি-এ, বিটি হেডমিস্ট্রেস বিজনের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে ভগ্নকণ্ঠে বললেন, তোমরা নিজেদের কথাই ভাবলে, কিন্তু আমি

যাবো কোথায় ? তুমি যা খুশি তাই করো, বাধা দেবো না। কেবল আমাকে তোমাদের আশ্রয়ে থাকতে দাও।

বিজন স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, তারপর চারিদিক একবার চেয়ে সস্নেহে তাকে তুলে ধরে বললে, আচ্ছা, কথা দিলুম, কোথাও যাবো না।

হরপার্ব্বতী-সংবাদ

মাথার চুলের রাশির মধ্যে দাড়া চিরুণীখানা টানতে টানতে নন্দিতা বললে, বলেছিলুম না তখন? এখন শুনতে পাচ্ছ ত?

টেবিলের কাগজপত্রের উপর কলমটা রেখে মুখ ফিরিয়ে সুপ্রিয় বললে, শুনিনি কিছু, অত গোলমাল কিসের?

জানো না? আদর দেবার বেলায় তখন ত দশখানা হাত বার করবে। আমি তখনই জানি কপালে দুঃখ আছে। এখন সামলাও!

আরে কি হোলো তাই আগে শুনি?

হবে আমার শ্রাদ্ধ। ইচ্ছে হয় বাইরে গিয়ে বড় বড় কান দুখানা পেতে শোনো গে।

সুপ্রিয় হেসে বললে, বড় কান আমার না তোমার?

রাগ করে নন্দিতা বললে, আচ্ছ, আমার না হয় বড় কান আমি গাধা। আর তুমি? দাঁত বের করে হাসছো যে বড়! দাঁত ত নয়, দাঁতাল।

সকাল বেলাতেই ঝগড়া আরম্ভ করলে ত? তবু শুনতে পেলুম না বাইরে গোলমালটা কিসের।—সুপ্রিয় বললে, আরে, শোনো, চলে যেয়ো না—আচ্ছা গাধার কান নয়, ইঁদুরের কান,—হয়েছে ত? এবার শোনো।

এলো-খোঁপা পিছন দিকে ফিরিয়ে নন্দিতা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। খরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে. রাতের জানোয়ার দিনে হয় মানুষ, কেমন?

হাসিমুখে সুপ্রিয় বললে, আরেকটু কাছে এসো। ঝগড়াও করবে অথচ হাতের নাগালের বাইরেও থাকবে এ আমার অসহ্য। এসো বলছি হাতের কাছে।

মুখ দেখলে ঘেন্না করে।—বলে মাথায় একটা প্রবল ঝাকুনি দিয়ে নন্দিতা চলে গেল।

কিন্তু পড়াশুনোয় সুপ্রিয়র আর মনোযোগ দেওয়া হোলো না। বাইরের গোলমাল তখনও থামেনি। উঠে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছুই নয়। তার বেবি কুকুরটা এমন একটা গণ্ডগোল প্রায়ই বাধিয়ে বসে। কুকুরটা আজকাল ভারি দুষ্ট হয়েছে। শৈশব থেকে এখানে সে মানুষ, আদরে ও যত্নে লালিত, এখন তার চেহারায় ভঙ্গীতে ও কণ্ঠে এসেছে তারুণ্য,

রোখটা বেড়ে গেছে। এই পাড়ায় সে কাকে যেন তেড়ে গিয়েছিল, সে বাড়ীর কর্তা গিয়েছেন ক্ষেপে। বলছেন: পুলিশে খবর দিয়ে এখুনি ফাইন করাতে পারি, তা জানো? ওদের জানিয়ে দিয়ো, বড়-মানুষি ফলাতে হয় ভবানীপুর ছেড়ে বালিগঞ্জে যাক্, এদিকে ওসব চলবে না। আমরা হালদার পাড়ার ছেলে, অমন ঢের ঢের চালাকি দেখেছি।

সুপ্রিয় বললে, তথাস্তু।

মুখ ফিরিয়ে নন্দিতা বললে, নির্লজ্জ তুমি।

কেন নির্লজ্জ? যেতে বলছে বালিগঞ্জে, তাই যাবো। —সুপ্রিয় বললে, হালদার পাড়ায় যে কুকুর মার খায়, বালিগঞ্জে গিয়ে সে মাথায় চড়ে বসে। জানোয়ারের ওপর মমতা আধুনিক কালচারের লক্ষণ। তুমিই ত' সেদিন বলছিলে, জানোয়ার থেকেই মানুষ, না মানুষ থেকেই জানোয়ার? ওরে, এই কেষ্ট?

আজ্ঞে, বাবু?

ওপরে আয়।

চাকরটা উপরে উঠে এলো। নন্দিতা মুখঝামটা দিয়ে বললে, হতভাগা, তোকে না বলেছি দিনের বেলা বেবিকে বেঁধে রাখবি?

ভীষণ অভিযোগ জানিয়ে কেষ্ট বললে, তাই ত রেখেছিলুন মা, কিন্তু শেকেল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

সুপ্রিয় বললে, ওদের বাড়ীর লোককে কামড়াতে গিয়েছিল না রে?

আজ্ঞে না বাবু, ও-লোকটা আকাট মিথ্যুক। আমাদের বেবির সঙ্গে অন্য কুকুরের ঝগড়া বেধেছিল, ওনার ছেলে মারলে ঢিল, তাই কেবল একটু গোঁ গোঁ করেছিল!

নন্দিতা বললে, অন্য কুকুরের সঙ্গে যদি ঝগড়া করে, তুই দরজা বন্ধ করে রাখিসনে কেন?

রাখি বৈকি মা—কেষ্ট বললে, তবুও সেদিন ছুটে বেরিয়ে গেল অত বড় পাঁচিল ডিঙিয়ে; কী গায়ে জোর। যাদি কুকুররা বাঁধা থাকতে চায় না।

থাম, নিজের কাজে যা।—বলে নন্দিতা তার আগেই নীচে নেমে গেল। সুপ্রিয় ততক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছে।

একটু পরেই বেবির দীর্ঘ আর্ত্তনাদে আবার সুপ্রিয়র শান্তি ভঙ্গ হোলো। পড়াশুনো রেখে নীচে নেমে গিয়ে দেখলো, চেরীগাছের ছড়িটা হাতে নিয়ে কোমর বেঁধে নন্দিতা বেবিকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করেছে। সুপ্রিয় দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতখানা ধরে ফেললে। আরে কী হচ্ছে? অত মারলে মরে যাবে যে!

মরুক, ওকে আমি খুন করব।

সে কি, ও যে অবলা!

ছাড়ো বলছি—

না।

তুমি ওকে অত আস্কারা দাও কেন ?

অবলা যে !

ফিক্ করে নন্দিতা হেসে ফেললে। কুকুরটা এই সুযোগে ল্যাজটা গুটিয়ে কাঠের বাক্সর পাশে গিয়ে লুকিয়ে কোঁ কোঁ করে কাঁদতে লাগলো।

হাসিমুখে নন্দিতা বললে, ছড়িগাছা এখনও হাতে আছে, সাবধান বলছি।

মুখ টিপে সুপ্রিয় বললে, সাবধানেই ত আছি। আমি মার খেয়ে মরে গেলে কানে হীরের দুল পরতে পারবে ত ?

ছড়িগাছা ফেলে দিয়ে নন্দিতা বললে, তাই বলে তোমার কুকুর পাড়ার লোককে কামড়ে আসবে ?

আর যারা ঘরের লোককে কামড়ায় ?

মুখ ফিরিয়ে বিদ্যুদ্বেগে নন্দিতা ছড়িগাছা হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করতেই সুপ্রিয় সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। নন্দিতা ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, আমি কামড়াই, কেমন ? হীরের দুলের ধাপ্পা তুমি আর কতকাল চালাবে শুনি ?—এই বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সুপ্রিয় হাসছিল। দু'জনের ভিতরকার এই অদ্ভুত আর অহেতুক সংঘাতটা প্রায় নিত্যদিনের। এখানে সম্প্রীতির অভাব বলে ভুল ঘটতে পারে, কিন্তু অন্ততঃ ওদের দুজনের মধ্যে সে ভুল ঘটেনি। সুপ্রিয় কাগজ-

পত্রের মধ্যে মুখ রেখে চোখের তারাদুটো উজ্জ্বল করে হাসছিল। কুকুর কেন, সামান্য ব্যবহারিক খুঁটিনাটি নিয়েও ওদের বিবাদ চলে। এই যেমন ধরো সেদিন সুপ্রিয় নিজেই আরম্ভ করলে, শীঘ্র বলো, কেন ছিঁড়ে গেছে জামার বোতাম?

বোতামটা অবশ্য ধোবার বাড়ী থেকেই ছিঁড়ে এসেছে। কিন্তু নন্দিতা বলে, আমিই ছিঁড়েছি, বেশ করেছি।

এর ক্ষতিপূরণ?

ওঃ গবর্ণর এলেন শাসন করতে! যাও, বেরাও।

বাঁকা চোখে চেয়ে সুপ্রিয় বলে, মনে রেখো, আমি যদি পায়ে রাখি তবেই তুমি দাসী।

ঝঙ্কার দিয়ে নন্দিতা বলে, ওরে চরিত্রহীন, দাসীর সঙ্গে কোনো ভদ্রলোক—

হঠাৎ সুপ্রিয় দার্শনিক হয়ে ওঠে,—তাই ত ভাবছি, ঠিকই বলেছ। আমি ভাবি চতুরা স্ত্রীলোকের কী অদ্ভুত ইন্দ্রজাল!

আমি চতুরা—?—নন্দিতা বলে, ভিক্ষে চাইতো কে পেছনে পেছনে এসে? সাবধান কিন্তু সুপ্রিয়, আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো বলছি।

মুখের হাসি টিপে সুপ্রিয় বলে, আচ্ছা, দাও ভেঙে, দেখি তোমার হাঁড়িতে আর কি কি 'সন্দেশ' আছে আমিও তখন বলবো, হে সমবেত ভদ্রমহোদয় ও

ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, একটি বিষধর উর্ণনাভের জালে একটি নিরুপায় মক্ষিকা আবদ্ধ হয়েছিল। একটা অদ্ভুত চক্রান্তে সে বন্দী!

মুখখানা বিকৃত করে নন্দিতা বলে, মক্ষিকাই বটে, আঁস্তাকুড়ের মাছি।

থুড়ি।—সুপ্রিয় বলে, মক্ষিকা নয়, ভ্রমর। আর সেই ভ্রমরের পাখার গুঞ্জনে বসন্তরাগ শুনে রক্ত-গোলাপ মাথা দুলিয়ে উঠতো।

অমনি নন্দিতা হেসে ফেলে, আমি মাথা দোলাতুম? কী মিথ্যেবাদী তুমি? কবিতা লিখে পাঠাতো কে শুনি?

পুরানো কথাটা সুপ্রিয় স্মরণ করিয়ে দেয় কবিতার সুখ্যাতি করতো কে শুনি?

নন্দিতা বলে, স্বপ্ন-কন্যার রূপের প্রশংসা করোনি তুমি? আমরণ উপবাসের ভয় দেখিয়েছিল কে?

উত্তরটা তখনই সুপ্রিয় যুগিয়ে দেয়, হে ঈশ্বর, তুমি সাক্ষী। কবির কোঁকড়া চুল আর কালো চোখের তারার কে জানিয়েছিল সুখ্যাতি গোপনে?

নিজের চেহারার কি গর্ব্ব! বেহায়া!

...বলে তখন নন্দিতা রণে ভঙ্গ দেয়।

আগে নতুন ঘর-কন্নায় সুপ্রিয়র মন বসতে চায়নি। আগে মনে হয়নি তাকে ভাবতে হবে বাজার খরচের কথা, তেল-নুনের খরচ, চাকর-বামুনের মাইনে। এ

যেন তার কাছে একটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা। নন্দিতাকে সে বরাবর জানিয়ে এসেছে আকাশের চেহারাটা উজ্জ্বল নীল আর লোয়ার সার্কুলার রোডের রাত্রির দৃশ্যটা হেমন্তের কুয়াসা আর স্তিমিত আলোকস্তম্ভ মিলিয়ে একটা স্বপ্ন-জড়ানো রহস্য পথ। নন্দিতার চুলের অরণ্যে নববর্ষার যেন ঘনঘটা, আর মুখে শরতের সোনার রৌদ্র ঝলোমলো. আর আঁচলে উচ্ছ্বসিত চৈত্রপূর্ণিমার দোলা। আগে সুপ্রিয় ঘুমিয়ে পড়তো নিবিড় তন্দ্রায় মোটরের মধ্যে নন্দিতাকে ঘিরে. রবারের চাকায় জড়িয়ে যেতো কলকাতা সহর পাকে পাকে, ঘন আলিঙ্গনে যেতো মিলিয়ে রেড রোড আর চৌরঙ্গীর পাতাল পথ। আশ্চর্য সেই অতি পরিচিত অপরিচয় কথা বললে যেন ধ্যান ভেঙে যেতো। ঘুমের রসে টস টস করলে কণ্ঠস্বর—যেন দূরের কোন্ এক তপোবনে তপস্বীর মৃদু স্তবগান।

দেওদারের শুষ্ক বিশাল ছায়ায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চক্ষে সুপ্রিয় বললে, ঘোমটা দাও মাথায়।

না।—নন্দিতা আদরে জড়িয়ে বললে. আড়াল করতে পারবো না তোমাকে।

আড়াল খুলে আবিষ্কার করে নেবো।

লজ্জা করে যে তোমার সামনে ঘোমটা দিতে। কেন?

আগে থেকেই ত দেখে নিয়েছ। আড়ালে রাখার আর আছে কি?

শীতের মধ্যাহ্নে দেওদারের নিভৃত শুদ্ধ ছায়ায় দাঁড়িয়ে নন্দিতা আবার বললে, নতুন বউ আসে ঘোমটা দিয়ে, সেই জন্য তাকে খুঁজে বার করতে হয়।

সুপ্রিয় বললে, হোলো না। বরকে যতই জানতে থাকে ততই ঘোমটা খোলে মেয়েরা।

বিয়ের পরেও নন্দিতা ঘোমটা দিলে না, সিঁথির সিন্দুর লুকিয়ে রাখলো একপাশে চুলের ঘন অন্ধকারে— অরণ্যের গভীরে যেমন গোপন থাকে অগ্নিশিখা। এটা কেমনতরো? নন্দিতা বললে, আমাদের তরুণ কৌমার্য্যকে জাগিয়ে রাখবো দুজনের সম্মানে চিরন্তন করে।

রাখিপূর্ণিমার রাত্রে ওরা ষ্টীমারে চলেছিল বদরতলা পেরিয়ে। আকাশের এক পারে শরতের চন্দ্র, অন্য পারে মেঘের মন্দ্র। সুপ্রিয় বললে, পারবে?

তার হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে নন্দিতা নতমুখে বললে বোধ হয় পারবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো প্রতিজ্ঞাই থাকে না।

সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর সেই চন্দ্রবরণ নদীর উল্লোলে উচ্ছ্বসিত দোলায় দুলে উঠলো। অনাদি আর অনন্ত-কাল তার সেই আবেগের মুহূর্তের উপরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। বললে, নন্দিতা, ভুলতে ইচ্ছে করে না আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের উল্লাসের দোলা, আমার বুকের রক্তে যখন কবিতা লিখেছিলুম

আর তুমি সেই রক্তে দুই চরণ রাঙিয়ে এসে দাঁড়ালে !

স্টীমার সেদিন যেন জীবন-মরণ বিদীর্ণ করে চলেছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে অথৈ অজানায়।

সুপ্রিয়র চমক ভাঙলো। এর মধ্যে কখন বেবি নীচে থেকে এসে তার পায়ের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। সেদিনটা নেই বটে, কিন্তু এখন এসেছে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি। প্রথম প্রবাহটার সেই খরবেগ এখন মন্থর, জীবনযাত্রাটা দুই দিকে এখন বিস্তৃত, গভীর হয়েছে বলেই উপরটা প্রশান্ত, প্রথম অবস্থাটা চঞ্চল ছিল বলেই দিশাহারা, এখন লক্ষ্যটা স্থির, তাই নিরুদ্বেগ।

চুড়ির আওয়াজে সুপ্রিয় মুখ ফিরিয়ে তাকালো। নন্দিতা ঘরে এসে দাঁড়িয়ে বললে, পায়ের তলায় এসে বুঝি ঢুকেছে ? ওকে আমি তাড়াবো।

সুপ্রিয় বললে, তাড়ালে যাবে কোথায় বেচারা !

কুকুরের নেশা নিয়ে তোমাকে আমি থাকতে দেবো না।

তুমি ছাড়া বুঝি আমার আর কোনো নেশা থাকতে নেই ?

না।—বলে নন্দিতা কাছে এলো। সুপ্রিয়র গলাটা তার চুড়িভরা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর মুখ রেখে বললে, তোমার আর কোনো নেশা আমার বরদাস্ত হয় না।

সুপ্রিয় বললে, কেন বলো ত ?

শুনলে, তুমি আস্পর্দ্ধা পাবে তাই বলতে ইচ্ছা করে না, আচ্ছা বলো, অভয় দিচ্ছি।

নন্দিতা বললে, সহজে ত পাইনি, পেয়েছি, অনেক দুঃখে তাই কেবলি হারাবার ভয়। তুমি আর কিছুতে মনে দিতে পাবে না।

সে কি, ঈশ্বর-চিন্তাও নয় ?—সুপ্রিয়র চাহনিতে ভীষণ বিস্ময়।

নন্দিতা তার মুখখানা টিপে ধরে বললে, নাস্তিকের মুখে ঈশ্বরের নাম শোনাও পাপ। আর বলবে ? বলবে আর ?

আঃ ছাড়ো ছাড়ো, সতী নারীর চুড়ির ঘায়ে মুখখানা কেটে গেল বুঝি।

বেবি এইবার কোনো আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কা করে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল। সুপ্রিয় বললে, ওর সঙ্গে তোমার একটা আড়ি আছে।

হেসে নন্দিতা বললে, ও আমার চোখের বালি ! ওই যে বেরিয়ে গেল, এ-বেলায় আর বাড়ী ঢুকবে না।

সুপ্রিয় তার কোমরে বাঁ হাতখানা জড়িয়ে বললে, সংসারের সঙ্গে তুমি মানাতে পারো না, তাই আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাও। তাই না ?

অমনি গোঁজামিল দিচ্ছ, কেমন ?—নন্দিতা বললে, ঠিক উল্টো, তোমাকে বাগ মানাতে পারিনে ঘরকন্নায়,

তাই এত ঠোকাঠুকি। এই যে সকালবেলা থেকে বসে রইলে, করলে কি বলো দেখি?

করতে ত বলোনি?

বলে না দিলে বুঝতে পারো না? বাজার হোলো কোথেকে, রান্না হোলো কি দিয়ে? না হয় জানলুম চাকর-বামুন আছে কিন্তু খোঁজ-খবর রাখা?

সুপ্রিয় বললে, এও আমাকে করতে হবে? বিয়েটা ফিরিয়ে নাও নন্দিতা, এসব আমি পারবো না। বলো কি, বাজারের হিসাবে? মুদির ফর্দ? গয়লার পাওনা?

একখানা চেয়ারেই দুজনে ঠেসাঠেসি করে বসলো, নন্দিতা হেসে বললে, ধোপার খাতা, বাড়ী-ভাড়া, ঘুঁটে-কয়লা—তা ছাড়া ডাক্তারি, মণিহারি, স্যাকরা, আরো কত কি।

আমাকে মুক্তি দাও, নন্দিতা। এসব আমি পারবো না। নন্দিতা স্বামীর গায়ে মুখখানা বুলিয়ে বললে, আরো রইলো। ব্যাঙ্কের জমা-খরচ, পোষ্টাপিসের খাতা ইন্স্যুয়ারেন্স পলিশি, পাটকলের শেয়ার, তোমার বাড়ীর খাজনা, ইন্‌কাম ট্যাক্স, সব ছাড়িয়ে তোমার চাকরি।

ব্যাকুল হয়ে সুপ্রিয় বললে, সবই ঠিক কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি? বিয়ে ফিরিয়ে নাও, নন্দিতা। বিয়ে আমি করিনি, ঘরকন্না আমি মানিনে। আমাকে ছেড়ে দাও, কেঁদে বাঁচি।

নন্দিতা তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, তখন মনে ছিল না ?

কখন গো ?

দেবদারুর ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।

সুপ্রিয় বললে, তখন কে জানতো তোমাকে পাওয়া মানে এতখানি উৎপীড়ন মাথা পেতে নেওয়া? হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলুম, মহারাণীর সকল দায়িত্ব আমি বহন করব ।

তবে ?—নন্দিতা প্রশ্ন করলে।

দাড়াও, তখন গয়লা-মুদি-ধোপা-কয়লাওলা কেউ গিয়ে দাঁড়ায়নি। তোমার প্রেমে মজতে গিয়ে তোমার ওই বর্ব্বর সন্তানদলের বীভৎস আক্রমণ আমাকে সইতে হবে এমন কথা ত হয়নি ?

নন্দিতা বললে, তবে না হয় চলো পালিয়ে যাই কোথাও ?

যেখানেই পালাবো তোমাকে নিয়ে, সঙ্গে থাকবে এই গোলকধাঁধা আর এই প্যারাফারনালিয়া। আর যাবেই বা কোথায় তুমি তোমার এই শরীরে ?

স্বামীর কাঁধের ওপর মাথা রেখে নন্দিতা বললে, সব গুলিয়ে দিলে তুমি। কিসে কি হোলো আমিও ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সুপ্রিয় বললে, পারবে আর কিছুদিন পরে। আমি কিন্তু বলে রাখছি নন্দিতা, হয় বিয়ে ফিরিয়ে নাও আর

নয়ত তোমার সন্তানদলের ছোঁয়াচ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। বিয়ে মানে দায়িত্ব, কিন্তু দায়িত্ব মানে ভদ্রজীবনের ওপর অত্যাচার নয়। টাকাকড়ি ঘরকন্না সবই তোমার আর তুমি কেবল আমার,—এই সর্ত।

নন্দিতা তার মুখের ওপর ঝুকে পড়ে বললে, তুমি কি সিরিয়স।

হাফ সিরিয়স। কারণ মনের কথা হেসে না বললে তোমার দরবারে আবেদনটা পৌছবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে নন্দিতা বললে, কোনো সর্তে আমি সংসার করতে পারবো না। তোমার যা খুসি তাই করো।

সুপ্রিয় বললে, এই অত্যাচার সইতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু ঘটে?

ঝঙ্কার দিয়ে নন্দিতা বললে, তবে তোমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।—এই বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেলা এগারোটার পর সুপ্রিয় খেদেয়ের আফিস বেরোলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল প্রবল উৎসাহে নন্দিতা ঘরের কাজে মন দিয়েছে। চাকরটাকে বললে, ওপরে আয় একবার আমার সঙ্গে—এই বলে সে কোমর বেঁধে একটা প্রবল তাড়নায় কাজে লেগে গেল। নতুন করে ভাবতে সেও জানে। মেয়েদের সৃষ্টিশক্তি নেই, এমন মতবাদ যাদের, নন্দিতা তাদের প্রতিবাদ।

নন্দিতার অত্যধিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু আজ তাকে বাগ মানানো যাবে না। স্বামীর মনের প্রবাহটা আবিল হলে স্ত্রীর পক্ষে দুর্দিন কিনা নন্দিতার জানবার দরকার নেই। কিন্তু পুরুষকে ঠিক বুঝতে না পারলেই নারীর মনে জমে ওঠে আশঙ্কা, তখন চুম্বন-আলিঙ্গনের আতিশয্যটাও নির্ভুল নিরাপদ বলে মনে হয় না। পুরুষের প্রাণের চিন্তাধারার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে না পারলে মেয়েদের স্বস্তি নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল অতিশয় পরিশ্রমে নন্দিতার কপালে চুলের আগুটগুলি বেয়ে কোমল কয়েকটি ঘামের ধারা নেমে এসেছে গাল বেয়ে। মুখে ললিত রক্তাভা, যেন ভিতর থেকে প্রভাতের তরুণ সূর্য্যোদয়ের আভাস। কিন্তু আর একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সবগুলিই ঘামের ফোঁটা নয়, টলটলে অশ্রুর ধারাও নেমে এসেছে তার সঙ্গে। বিড়ম্বিত জীবন তার নয়, কিন্তু এতদিন পরে আজ যেন একটা আকস্মিক ঝাপটায় মনে হচ্ছে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েও একজনকে আজও পরিপূর্ণ পাওয়া যায়নি, জটিল রহস্যের আঁকাবাঁকা পথ এখনও রইল সে অনেকদূরে, হয়ত ঘোমটা সরিয়ে ধীরে ধীরে তাকে আবিষ্কার করলেই পাওয়া সহজ হোত। সংশয়ের দ্বন্দ্বে আর বুঝতে না পারার অনুতাপ নিরুপায়

নন্দিতার মনে কেমন যেন একটা আসন্ন ভূমিকম্পের থরোথরো কম্পন এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত শঙ্কায় আকুল ক'রে তুলেছে। ওদের ভালবাসার আগডালে সুগন্ধ ফুল ধরেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মৃত্তিকার নীচে মূল এখনও গভীরে নামেনি। ফুল ফোটার চেয়ে শিকড়ের দিকে কোন নজর নেই!

সন্ধ্যার সময় সুপ্রিয় ফিরে এলো। সে আসে একটা সমারোহ সঙ্গে নিয়ে। মোটা টাকা মাইনে পায়, কিন্তু রোজ-রোজ নতুন-নতুন মোটর চড়বার লোভে সে দামি ট্যাক্সি চ'ড়ে আসে, মোটর আজো কেনেনি। সঙ্গে আসে মণিহারি, ব্যাঙ্কের খাতাপত্র, চৌরঙ্গী গ্রীলের খাবার, নিউ মার্কেটের ফুল কোনো কোনদিন মুখ-রোচক আসাময়িক দামী আনাজ-তরকারী।

গাড়ী থেকে নেমে এসেই স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে একেবারে বিস্ময় স্তম্ভিত। আজ কি ভুল ক'রে সে অন্য বাড়ী ঢুকেছে?

কাছে এসে নন্দিতা বললে, দেখছ কি বোকার মতন? এই ব'লে মাথার টুপিটা খুলে নিলে।

সুপ্রিয় শুধু বললে, হতবুদ্ধি!

অমন হাঁ ক'রে থাকলে আমি কিন্তু সব টান্ মেরে খুলে ফেলবো।

আজ তার কপাল থেকে সিঁথির ভিতর অবধি সুদীর্ঘ বিস্তৃত সিন্দুররেখা। পরণে গঙ্গারঙের রেশমি

রাঙাপাড় শাড়ি, আঁচলে চাবির গোছা, মাথায় ঘোমটা। সুপ্রিয় রাঁধুনি বামুন আর চাকরটাকে লুকিয়ে নন্দিতাকে কাছে টেনে নিল। বললে, নতুন কিনা, তাই ভাল লাগছে।

নন্দিতা বললে, আজ কিন্তু তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না।

সে কি, গাড়ী আনলুম যে তোমার জন্যে! তুমিই ত' বেড়াতে যাবার জন্য পাগল, আমাকেই ত' তুমি তিষ্ঠতে দাওনা!

না, চলো ছাদে বেড়াবে, আজ পূর্ণিমা।

গাড়ী ফিরে গেল। ঠিক বোঝা গেল না,—নতুন ক'রে মিলনের আনন্দ, অথবা আজ অভিনব উপায়ে পরস্পরকে জানার আগ্রহ? রমণীর বেশ ছেড়ে আজ হঠাৎ গৃহলক্ষ্মীর ছদ্মবেশ কেন?

গলাধরাধরি ক'রে ওপরে উঠে গিয়ে সুপ্রিয় বললে রস ঢেলে দিয়ে আজ মাতাল করবে, না অমৃত ঢেলে ঘুম পাড়াবে, নন্দনবাসিনি?

সুপ্রিয়র বোতাম-খোলা কোটখা মুখের উপর টেনে নন্দিতা বললে, রসটা ছেঁকে নিলেই অমৃত।

সঙ্গীত, না সুভাষণ?

দুটো মিলিয়ে যা হয়,—কবিতা! ঘরে চলো।

ঘরে ঢুকে সুপ্রিয় অবাক হয়ে গেল। যে-ঘরে সকাল বেলা সে ছিল, এ ঘর সে নয়। তার চকচকে চোখের

তারা চারিদিক থেকে ঠিক্‌রে পড়তে লাগল। যা ছিল তা সবই আছে, কিন্তু ভিন্ন চেহারায়, ভিন্ন ভঙ্গীতে। পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে নয়, প্রাণবৈচিত্র্যটাই যেন সজীব। এ-দেয়ালের ছবি ও-দেয়ালে, এধারের খাট ওধারে, নতুন হ'য়ে এসেছে ফুলদানি, চায়না গ্লাস ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণে, মখমলের জাজিমে রেশমি তাকিয়া, পোর্ট্রেটগুলোর বদলে ল্যাণ্ডসকেপ এসে সমস্ত ঘর-খানার ভিতরে কল্পনার একটা অসীম ব্যাপ্তি এনে দিয়েছে।

পরদা সরিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে নন্দিতা স্বামীকে নিয়ে গেল। এ আবার নতুত জগৎ। এ ধারে সোফা আর ইজি-চেয়ারের সেট্, ওধারে পিয়ানো। দেয়ালের গায়ে গায়ে বইয়ের আলমারি, কোনে কোনে পিতল আর পাথরের পুতুল, মাঝখানে কাঁচের টেবলের উপর চীনা আর তিব্বতী কিউরিয়ো, জানলার স্কীণ-গুলিতে সুন্দর কারুকলা চিত্রিত।

সুপ্রিয় বললে, পেলে কোথায় এত ?

নন্দিতা বললে, সবই ছিল।

দেখতে পাইনি ত ?

চোখ ছিল না তোমার। এসো, এবার কাপড় ছাড়বে।

শোবার ঘরে এনে সুপ্রিয়কে খাটের উপর বসিয়ে নন্দিতা তার পায়ের জুতো আর মোজা খুলে নিলে। ঠাকুর খাবার নিয়ে এলো হাতে ক'রে। কচুরি, নিম্‌কি

আর সন্দেশ দেখে সুপ্রিয় বললে, কি রকম যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। হঠাৎ আজকে এমন রাজোচিত আতিথেয়তা আরম্ভ হোলো কেন,—ব্যাপারটা কি বলো ত' ঠাকুর?

ঠাকুর টিপাইয়ের উপর খাবার আর জল রেখে যাবার সময় বললে, সবই মা তৈরি করেছেন!

লক্ষণ ভাল নয়। যুদ্ধের চেয়ে সন্ধির চেহারা দেখলেই আমার ভয় করে।

কেন?—নন্দিতা হাসিমুখে প্রশ্ন করলে।

মনে হয় তখন বুঝি তোমাকে আর চিনতে পাচ্ছিনে। ঝগড়া ক'রে কী হবে?

সুপ্রিয় বললে, এতেও আমার দুশ্চিন্তা। তুমি চুপ ক'রে থাকলেই মনে হবে দূরে স'রে যাচ্ছ। তোমার মুখ বন্ধ হ'লেই আমার হবে পরাজয়। আমি সীতাও চাইনে, দ্রৌপদীও নয়, আমি চাই সুভদ্রাকে। আমার হাতে ধনুর্বাণ, তার হাতে অশ্ববল্গা।

হয়েছে। এবার 'বীরের তনুতে লহ তনু।'—এই ব'লে উঠে নন্দিতা হাত ধুয়ে স্বামীর মুখে একখানা কচুরি পুরে দিল, তারপর সুপ্রিয়ের কোমরের বোতামগুলি খুলে ট্রাউজার ছাড়িয়ে নিয়ে ধুতিখানা জড়িয়ে দিতে লাগলো।

* * *

মাস পাঁচেক পরে অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে সুপ্রিয় সেদিন সন্ধ্যার সময় হাসপাতালে খবর নিতে এলো। ডাক্তার

হাসিমুখে বললেন, ক্যাবিনে যান, আপনার স্ত্রী ভালো আছেন।

মুখের উপরকার অস্বস্তির ছায়া আনন্দে রূপান্তরিত হোলো। সুপ্রিয় সোজা দোতালায় উঠে গিয়ে সাত নম্বর ক্যাবিনে ঢুকলো। নার্স নমস্কার জানিয়ে বললে, সন্দেশ আনুন।

সুপ্রিয় হাসলো, তারপর আড়ষ্ট পা দুখানা টেনে নন্দিতার কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ আবার স্ত্রীর সঙ্গে তার নতুন ক'রে পরিচয়। লজ্জা নয়, কিন্তু আনন্দের অসহনীয় অস্বস্তিতে নন্দিতা বালিশে মুখ লুকিয়ে রইলো। মিনিট দুই পরে দেখা গেল, তার নাক বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পাশের নবজাত সুন্দর শিশুর ছোট বালিশটিও ভিজে গেছে।

নার্স বাইরে গেল। মাথার কাছে ব'সে রুমাল দিয়ে সুপ্রিয় নন্দিতার চোখ মুছিয়ে দিল। হাতখানা একটু কাঁপলো। রমণী রূপান্তরিতা জননীতে, আজ তাকে যোগ্য সম্ভ্রম না দিলে আর চলবে না। সুপ্রিয়ের হাতখানা আবার সন্তর্পণে ফিরে এলো। কিন্তু অশ্রু কেন আজ? হয়ত নন্দিতার সেই জীবনটা এবার মুছে গেল,— সেই দেওদারের ছায়াপথ, প্রিয়সান্নিধ্যে সেই অপরূপ জ্যোৎস্নায় অবগাহন, চৌরঙ্গীর আবেশ-বিহ্বল স্বপ্নলোক, তরুণ কৌমার্য্যের মালঞ্চে বাসকশয্যা। সেই জীবনের বিচ্ছেদবেদনা আর এই নূতন জীবনের

আনন্দ,—হয়ত এই অশ্রুতে তার বিচিত্র সংমিশ্রণও ছিল।

সুপ্রিয় নতমস্তকে নূতন শিশুটির দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে নন্দিতা বললে, বাড়ীর খবর কি? ঠাকুর চাকর আছে ত?

আছে।

ঠিক সময় খাওয়া-দাওয়া হয়?

হ্যাঁ।

ভাঁড়ারের চাবিটা নিজের কাছে রাখো ত?

হ্যাঁ।

একটু চুপ ক'রে থেকে নন্দিতা বললে, কুকুরটার খোঁজ পেলে কিছু?

নিশ্বাস ফেলে সুপ্রিয় সজাগ হ'য়ে বললে, হ্যাঁ, দশবারো দিন পরে কাল সকালে দেখি, আমাদের বা'র বাড়ীর সিঁড়ির তলায়।

পোড়ারমুখি ছিল কোথায় এ-কদিন?

সুপ্রিয় হেসে বললে, আরে সেই কথাই ত বলছি। তোমার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। চেহারা দেখে সন্দেহ হোলো, সিঁড়ির তলায় ঢুকে দেখি বেবির তিনটে বাচ্চা হয়েছে।

অ্যাঁ?

বাচ্চা গো। একটা নয়, তিন-তিনটে। আর তাকে তাড়াতে তোমার মন উঠবে না, দেখো কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বাচ্চাগুলো।

নন্দিতা মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে প'ড়ে রইলো।

রুক্মিনী

নিস্তব্ধ কয়েকটি মূহূর্ত, নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত নাই। সেই মূহূর্তগুলি যেন দরজার বাহিরে ধূম ও কুয়াশা জড়ানো শীতের রাত্রির মতোই অসাড়, নির্ব্বাক আর ভয়ঙ্কর। রাজপথে লোক চলাচল থামিয়া গেছে, পাথরের উপর দিয়া লোহার চাকার চলমান আর্ত্তনাদ আর শোনা যায় না, আলোগুলি মুমূর্ষু রোগীর চক্ষুর মতো স্তিমিত হইয়া রহিয়াছে।

বলিলাম, তোমার জন্য এসেছি।

গলিপথের এক দরজায় উঠিয়া মেয়েটি কহিল, ঘরে এসো। বলিয়া হাসিল।

ঘরের দরজায় আসিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এসেছি, তোমার নাম রুক্মিনী ত?

এখন ও-নামটা বদ্‌লেছি, আমার নাম রোহিনী। তুমি কেমন ক'রে জানলে আমার নাম?

উত্তর দিলাম না, কেবল হাসিলাম। আমার চোখের দৃষ্টি আলোর শিখার মতো কাঁপিতেছিল, দেবমন্দিরের দ্বারে ভক্তের হৃদয়ের মতো থরথর করিতেছিল। বছরের পর বছর পথে পথে ঘুরিয়া আজ এই রাত্রে তাহার সন্ধান পাইয়াছি, আমার উল্লাস প্রকাশ করিবার আর শক্তিও নাই। কিন্তু সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, তুমি কি পিছু পিছু আসছিলে?

বলিলাম, হ্যাঁ।

আমাকে কেমন ক'রে চিন্‌লে?

বলিলাম, আমি তোমাকে চিনি, অনেক কাল থেকে চিনি। মনে পড়ে তুমি বাগবাজারে ছিলে তোমার সেই স্বামীর সঙ্গে?

রুক্মিনী বলিল, স্বামীর সঙ্গে! ও, ছিলুম, ছিলুম, সেই সাধুর আশ্রমের পাশে বস্তিতে। তুমি বুঝি তখন থেকে জানো আমাকে?

বলিলাম, আমি সেই সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করতাম। রুক্মিনী, তুমি আমাকে এখনো চিন্‌তে পারোনি?

রুক্মিনী আলোটা লইয়া আসিল, তারপর আমার মুখের উপর তুলিয়া অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিল, তারপর কহিল, না, চিন্‌তে পারছিনে, কে তমি?

বলিলাম; তোমাকে দেখতুম রাস্তার কলে স্নান করতে কী রূপ তোমার! কী স্বাস্থ্য! তোমার রাঙা মুখ আর

শাদা শরীর ফুটে উঠতো ভিজে মলমলের শাড়ী দিয়ে, তোমার সুগোল সুন্দর হাতের তালে তালে আমার বুকের রক্তে লাগতো দোলা। রাত্রের ধাঁধাঁ নয়, মদের নেশা নয়, ভক্তের ফাঁকা উচ্ছ্বাস নয়! সূর্য্যের আলোয়, সকাল বেলা, রাজপথে, লোকজনের সমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতুম তোমাকে। কী রূপ তোমার!

রুক্মিনী আবার আমাকে একবার লক্ষ্য করিল কিন্তু বুঝিলাম, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আমাকে চিনিতে পারিল না।

আমি বলিলাম, আঃ সে কী দিন! আকাশের নীল উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে কাঁপতো আমার প্রাণ। সমুদ্রের তরঙ্গের ওপরে যেমন কাঁপে প্রভাত সূর্য। আমি তোমাকে দেখতাম। ভুলে যেতাম আমি সন্ন্যাসীর আশ্রমের মানুষ, ভুলে যেতাম আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান।

রুক্মিনী বলিল, ভেতরে এসে বসো।

এই বসি। রুক্মিনী, এবার তোমাকে পেয়েছি বহু সাধনায়, বহু আরাধনায়। এই বলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া অনর্গল উচ্ছ্বাস করিতে লাগিলাম, তুমি আমার কল্পান্তকালের মেয়ে, তোমার দুই চোখে আমার জীবন আর মৃত্যু, তোমার দুই হাতে আমার সৃষ্টি আর প্রলয়! আ, কী সুন্দর তুমি।—কেন সুন্দর জানো? তোমার চোখে সেদিন ছিল অদ্ভুত শুচিতা, অদ্ভুত সারল্য। আমি স্ত্রীলোক চাইনে, চাইনে পতিতা, আমি চাই তোমাকে।

মনে আছে তুমি সেদিন আমাকে কী বলেছিলে?

রুক্মিনী বিছানার উপর বসিল। বলিল, মনে নেই ত?

বলিলাম, আমার মনে আছে. তোমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি চোখের পলক। তুমি হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবু, তুমি কি আমাকে পছন্দ করেছ?—আ, রুক্মিনী, তোমার সেই হাসি, সেই তোমার বাহুলতার আন্দোলন. আমার আর সন্ন্যাসীর আস্তানা ভালো লাগেনি।

রুক্মিনী হাসিয়া আমার হাত ধরিল। কহিল, পাগল। এত মদ খেয়ে এসেছ কেন?

এবার হাসিমুখে বলিলাম, কই, খুব নেশা হয়নি ত?

তোমার চোখ যে লাল?

লাল চোখ তোমার জন্যে। তোমার স্বপ্নে চোখ লাল। তোমার কল্পনায় কালো রাত রাঙা, আমার প্রাণপদ্ম রক্তাক্ত।

কতদূর থেকে আসছিলে সঙ্গে সঙ্গে?

ও. অনেক দূর। চার বছর ধ'রে পথ হাঁটছি তোমাকে পাবো বলে, তোমার কাছে এসে পৌছবো ব'লে। আজ চার বছর ধ'রে তোমাকে স্বপ্ন দেখছি, রুক্মিনী।

রুক্মিনী আলোটা দূরে রাখিয়া আসিল। আলোটা কিছু ক্ষীণ, তাহার দরিদ্র ঘরে বিশেষ কিছু চোখে পড়ে

না। কিন্তু আমার রাঙা চোখের ভিতরে অদ্ভূত মোহ, মনোহর আত্মবিস্মৃত স্বপ্ন। আবেশ বিলোল দৃষ্টিতে আমি রুক্মিনীর দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার বাহু, তাহার বিশাল কালো চোখ, তাহার বক্ষের সুডৌল ঐশ্বর্য্যসম্ভার, তাহার পাথর কাটা কঠিন দেহ।

আমি ভাবিতে পারি না রুক্মিনী পতিতা। পতিতা বলিয়া তাহাকে মনে করিতে আমার লজ্জা করে। প্রথম যেদিন তাহাকে দেখি, তাহার মুখে ছিল সুন্দর, শুভ্র পবিত্রতা, কৌমার্য্যের বিশ্বজয়ী লাবণ্য—যে লাবণ্য আমার জাগরণে স্বপ্নে ও চিন্তায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত।

কী দেখ্‌ছ? রুক্মিনী জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার ললিত কণ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। নেশার ঝোঁকে গলগল করিয়া আমার মুখ দিয়া নির্ব্বোধ অর্থহীন বন্যা বাহির হইতে লাগিল কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিলাম, দেখছি নিজেকে তোমার আয়নায়। তুমি আমার প্রিয়তমা। এই আলো সাক্ষী সাক্ষী ওই অন্ধকার রাত্রি—,ফুলের গন্ধে আমার প্রাণের মন্দির ভ'রে গেছে। আমার জীবন মরণকে তুমি মুগ্ধ করেছ রুক্মিনী, তোমার চোখে আমার আশা আর আনন্দ। চার বছর! যন্ত্রণা দিয়েছ তুমি, অভিশপ্ত করেছ তুমি, প্রেতের মতো শহরের পথে পথে আমি উন্মাদের চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। রুক্মিনী, আমি জানি আমার এই ঐকান্তিক বাসনা যদি

ঈশ্বরের দিকে ফেরা ন যেতে আমি ঈশ্বরকে পেতাম, এই আগ্রহ দিয়ে আনতাম ব্রহ্মাণ্ডকে টেনে; আমি বড় হতাম. সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হ'তে পারতাম; আমার এই কামনা শিল্পীর, বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার। কিন্তু সব এনেছি তোমার পায়ের তলায়—আমার প্রেম, আমার ত্যাগ, আমার স্বপ্ন, আমার বাসনা। আঃ যেদিন তোমাকে আর খুঁজে পেলাম না সেখানে, কী মনে হোলো জানো? মনে হোলো, ওই আলোর পথ ধরে গিয়ে সূর্য্যদেবের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে ছিঁড়ে আনি, পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে আনি বাসকীর আত্মাকে, সাগরকে শোষণ ক'রে দিই, আকাশে আকাশে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়ে বেড়াই।

রুক্মিনি তাহার একখানা হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিল। তারপর বলিল, তুমি আর কোনোদিন আসোনি এদিকে?

কোন্‌দিকে?

এই খবো মেয়েদের পাড়ায়?

না রুক্মিনী, আমি ঘৃণা করি। আমি ঘৃণা করি এই পাশবিকতাকে, ঘৃণা করি তাদের যারা কুকুরের মতন দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পয়সা দিয়ে কামুকতা চরিতার্থ করা, বীভৎস সম্ভোগের জীবন যাপন করা·····না, না, আমি ভদ্রসন্তান, সে আমি কিছুতেই পারিনে, রুক্মিনী।

রুক্মিনী কহিল, তুমি যত বড় ভাবছো আমি তত বড় নাই।

বড় নও তুমি?—আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি পবিত্র, তুমি যদি অশুচি হও আমার আগুনে পুড়িয়ে তোমাকে খাঁটি ক'রে নেবো। পতিতার ঘরে যারা কেবলমাত্র পতিতাকে খুঁজতে আসে তারা পশু, তারা কামুক, আমি তাদের ঘৃণা করি। আমি এসেছি তোমার মধ্যে সেই মানবীকে আবিষ্কার করতে, যে আমার জলন্ত স্বপ্ন, জাগ্রত আশা, যার মধ্যে পাবো অসীম করুণায় ভরা নারীর মন, স্নেহে আর সেবায় যে-নারীর চিরসহনশীল, যার মালিনা নেই; যার লাল বিলোল কটাক্ষ নেই। তুমিই সে নারী অনাঘ্রাত ফুলের মতো ছিল তোমার রূপ, লাবণ্যভরা তোমার দেহ।

রুক্মিনী হাসিতে লাগিল। কবি পুরুষের সকল কালের স্তাবকতা শুনিয়া চতুরা নারী যেমন করিয়া হাসে—এও তেমনি। সাদরে কহিল, এখনো বিয়ে করোনি দেখছি। বিয়ে হ'লে সেরে যেতো। কিন্তু যাক্‌গে, আজ সে কথা ভুলে যাও। তোমারই মতন একজন আমাকে ঠকিয়ে গেছে, ওই যাকে তুমি আমার স্বামী ব'লে জানতে। আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তায়, আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছি পথে পথে।

বলিলাম, তোমাকে আর একদিন দেখেছিলাম রুক্মিনী।

করে।

একদিন গাড়ীতে ক'রে যাচ্ছিলে, একটা লোক ছিল সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম অনেক দূর। কিন্তু তুমি হারিয়ে গেলে। তোমার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আচ্ছা রুক্মিনী, তুমি টাকা নাও ত?

রুক্মিনী বলিল, নৈলে আমাদের চল্‌বে কেমন ক'রে কত তোমাকে দিতে হ'বে?

চার টাকা।

কিন্তু আমি যে এবার থেকে তুবেলা আসবো, আমি যে থাকবো তোমার এখানে?

তাহ'লে কিছু কম দিয়ো।

রুক্মিনী, টাকার কথা তুমি কিছু বলো না। আমি লুকিয়ে তোমার বালিশের তলায় রেখে যাবো, যেন ভুলে টাকা ফেলে গেছি, তুমিও যেন হঠাৎ পেয়ে গিয়ে বাক্সে তুলে রাখবে। টাকা, টাকার বদলে তোমাকে পাবো এমন কথা আমাকে ভাবিয়ো না লক্ষ্মীটি।

রুক্মিনী বলিল, কিন্তু তুমি যদি না রেখে অম্‌নি চ'লে যাও?

এমন কথা তুমি ভাবতে পারো? আঃ, সত্যি দেহের ব্যবসা মানুষকে কত ছোট করে। তোমাদেরো মানুষ প্রবঞ্চনা ক'রে যায়? তারা কি এ কথা বোঝে না যে নিষ্ফল মাতৃত্ব তোমাদের মধ্যে কেঁদে বেড়ায়? তোমরা যে সকলের বড়! পুরুষের সকল লজ্জা তোমরা

বহন করো নিঃশব্দে। তোমরাই রাখো সমাজের স্বাস্থ্যশ্রী।

তুমি চুপ করো।—রুক্মিনী বলিল।

বলিলাম, আমি কি জন্য এসেছি জানো? তোমার কাছে ভালোবাসা পাবার জন্য নয়, এসেছি তোমার কাছে আত্মাঞ্জলী দেবো ব'লে। বলো রুক্মিনী, আমার ভালোবাসা তুমি গ্রহণ করবে।

কী বলছ গো ছেলে মানুষের মতন?

বলিলাম, রুক্মিনী, আজ সমস্ত রাত জেগে তোমাকে দেখব। আজ দেবো তোমার যোগ্য মূল্য, আজ জানিয়ে যাবো তুমি পতিতা বটে কিন্তু তুমি মেনকা, তুমি উর্ব্বশী; তোমার স্থান যদি মর্ত্ত্যেই নির্দ্ধারিত হ'য়ে থাকে তবে সে আমার মতো ভাগ্যবানের জন্য! রুক্মিনী তোমাকে পেয়েছি বটে কিন্তু এখনো ভালো ক'রে দেখিনি। বলিয়া আমি তাহার কাছে সরিয়া গেলাম।

সে আমাকে সরাইয়া দিল, অতি স্নেহে, অতি যত্নে,—যেন আমি তার পরমাত্মীয়, যেন তার প্রাণপ্রিয়। তারপর আমার ললাটে হাত রাখিয়া কহিল, এখনই পাগলামি ক'রো না। আগে বলো, আজ থাকবে ত?

আজ কেবল?—আমি বলিলাম, আজ, কাল, পরশু, মানে আর যাবোই না তোমার এখান থেকে।

তোমার বাড়ীতে কেউ নেই?

না, কেউ নেই। যদি বা থাকে তারা সবাই একদিকে, তুমি অন্যদিকে। একদিকে পৃথিবীর মানুষের দল, অন্যদিকে চন্দ্রকিরণ। রুক্মিনী, আলোটা বাড়াও। চোখে বুঝি তুমি কাজল পরেছ?

একটু পরেছি, এর নাম সুর্ম্মা।

আলোটা বাড়াও।

রুক্মিনী উঠিয়া ঘরের বড় আলোটা বাড়াইয়া দিল। তারপর বলিল, কী দেখতে চাও?

আমিও উঠিলাম। আলোয় ঘর হাসিতেছে, তাহার সঙ্গে হাসিতেছিল রুক্মিনী,—আমার দেবী, আমার দীর্ঘ চার বৎসরের স্বপ্নকন্যা। তাহার কাছে সরিয়া গেলাম। দেখিলাম তাহার চোখে কাজল, কিন্তু তাহারই চারিপাশে কেমন যেন বিগত যৌবনের কুঞ্চন রেখা। সে-চোখে আলো নাই, ঔজ্জ্বল্য নাই—তাহার সহিত যেন গভীর দুষ্কৃতি ও দেহবিলাসের অবসাদ জড়াইয়া আছে। কেমন একটা মলিন ছায়া, যাহার দাগ কেবল পুরাতন গণিকাদের দেহেই মাখানো থাকে। আমার মন অবশ হইয়া আসিল।

বলিলাম, মুখে কী মেখেছ?

আমার কম্পিত কণ্ঠস্বরে সে যেন একটু চমকাইল। বলিল, রং।

রং? সেই রূপ কোথায় তোমার? যে-রূপ আমি সেই প্রথম দিন দেখেছিলাম? কই দেখি!—এই বলিয়া আমি একটা প্রস্তাব করিলাম।

রুক্মিনী আমার চেহারা দেখিয়া কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভয় ও ভাবনার সহিত আমার আদেশ পালন করিতে লাগিল। এক সময় হঠাৎ থামিয়া কহিল, আমি পারব না।

পারতেই হবে। বলিয়া আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

সে বাধা দিল, আমি বাধা মানিলাম না। আমার চোখের নেশা, মনের নেশা ছুটিয়া গেল। এ আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কি সেই রুক্মিনী? আলোর শিখাটা যেন আমাকে রক্তাক্ত জিহ্বা দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। তাহার স্বাস্থ্য নাই, শ্রী নাই, তাহার রূপ নাই!

অসহ্য ঘৃণায় আমার চোখ ভরিয়া গেছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, এ কি হয়েছে তোমার? কোথায় সেই যৌবন, কোথায় সেই দেবতার সিংহাসন, রুক্মিনী?

আমার গলা ধরিয়া গেল। বীভৎস মাংসস্তূপ, বিবর্ণ, বিশীর্ণ বক্ষ, কদাকার মেদময় স্থূলতা,—আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রুক্মিনী নামের কঙ্কালটি কেবল দাঁড়াইয়া অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। যাহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি সেই রুক্মিনী এই মেয়েটি নয়। সম্ভবতঃ পতিতাকে আমি খুঁজি নাই, খুঁজিয়াছি সেই লাবণ্যলতাকে। পতিতার ভিতরে আশা করিয়াছিলাম আমার পুরাতন মানসী প্রতিমাকে, অকলঙ্ক

যৌবনকে। আমার কল্পনার প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল।

সে কহিল, তুমি বুঝি থাকতে চাও না?

আমার চোখে জল আসিয়াছিল। বলিলাম, না, আমি চ'লে যাচ্ছি।

আবার কবে আসবে? কাল?

কোনোদিন আর আসবো না।

উষ্ণকণ্ঠে সে কহিল, বেশ, তবে টাকা দিয়ে যাও। চার টাকা।

তাহাকে টাকা গণিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আর কোনোদিন পতিতালয়ে আসিব না. আজিকার এই করুণ ব্যর্থতাময় দিনটি আমার মনে থাকিবে, সহজে ভুলিব না। রাজপথ দিয়া অন্ধকারে চলিতে চলিতে ভাবিলাম, তবে কি রূপের তৃষ্ণা জীবনকে কেবল কুরূপ করিয়াই তোলে? তবে কি রুক্মিনী বাঁচিয়া নাই, এ তাহার প্রেতিনী? তবে কি হারাইবার জন্যই আজ তাহাকে এতকাল পরে খুঁজিয়া পাইলাম?

আমার বুকের ভিতরে যেন অশ্রু জমিয়া উঠিতে লাগিল,—সে অশ্রু ব্যর্থতার নয়, কেমন যেন নিজের ও সকলের প্রতি অসীম সমবেদনার।

———০॰০———

ঝড়

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা হতে বিলম্বই হয়।

আকাশের একদিকে অস্তগত সূর্য্যের রক্তরশ্মি তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু তারই অপর দিকে ঈশানের পর্ব্বতপ্রমাণ কৃষ্ণকায় মেঘ যুদ্ধযাত্রায় সেনাপতির মত সমস্ত আকাশের দিকে এগিয়ে আসছিল। প্রসন্ন ঝড়ের একটি ইঙ্গিত পেয়ে সবাই ইতিমধ্যে একটুখানি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

পুরাণদহের মাঠে কয়েকটা শুকনো খেজুরগাছ যেখানে একত্র জটলা করেছে, তাদেরই মাথায় কালোমেঘের ছায়া পড়েছিল। পাতাগুলি দুলে' দুলে' ঝড়ের সূচনা জানাচ্ছে। তারপর দেখতে দেখতে ধুলো উড়তে সুরু করল, সাদা বকের সারি অন্ধকার মেঘের নীচে দিয়ে অস্পষ্ট ডানার শব্দ করে উড়ে যেতে লাগল, শীর্ণ-তনু

নদীর ওপর নেমে এল ধীর-ছায়া। আভাস দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ানক একটা ঝড় উঠতে আর হয়ত সত্যিই দেরী নেই।

পশ্চিমের লালিত্যটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেতেই প্রসন্নকুমার তাড়াতাড়ি বাসার দিকে চলতে লাগল। নতুন জায়গা, ঝড়ও উঠছে, বাসায় মলিনাও আছে একা—দেরী করে আজ কাজ নেই।

পথ বেশীদূর নয়। ছোট একতালা বাড়ীর দরজা ঠেলে প্রসন্ন এসে ভেতরে ঢুকলো। প্রসন্নকুমার যুবক, কিন্তু একটি অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য তাকে যুবার চেয়ে প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সে কখন্ বাড়ী থেকে বেরোয় তা তার মনে থাকে না, কখন বাড়ীতে এসে ঢোকে তাও সে ভুলে যায়। তরকারী লাবণাক্ত না হলে তাকে ভাবতে হয় তরকারীর মধ্যে অভাবটা কি।

—ও, এই যে মলিনা। একটুখানি থমকে প্রসন্ন আবার বল্‌ল— আচ্ছা, বাইরের দরজাটা খোলাই রেখেছিলে?

—খোলা? কই খোলা ত ছিল না। কই দেখে আসি ত'।

—থাক্, খোলা যদি না থাকবে এলাম কি করে?

মলিনা মুখ না তুলে অন্যদিকে সরে গেল। যে জানালাটা বন্ধ, সেখানে সরে' গিয়ে দাঁড়াল। প্রসন্ন গায়ের জামাটা ছাড়্‌ল—বোধ-হয় তার গরম হচ্ছে।

সেটা ছেড়ে যত্ন করে' হুকের ওপর টাঙিয়ে দিয়ে বল্ল —এবাসাটা কেমন লাগছে মলিনা, বেশ সুবিধা হচ্ছে ত সব দিকে?

বোঝা গেল মলিনা ঘাড় নেড়েছে।

আচ্ছা, আমি যখন এসে ঢুকলাম তখন পায়ের শব্দ হয়েছিল?

মলিনা এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ তুলে বল্ল, কার?

—চমকে উঠলে কেন? আমার কথাই বল্ছি। তারপর মুখ ফিরিয়ে জান্লার বাইরে তাকিয়ে প্রসন্ন বল্ল. এইবার ঝড় উঠবে, আর দেরী নেই। আচ্ছা দেখেছ জটাজুট কালো মাথার চুড়ো? কি বিরাট বিপুল! আমি তাই দেখছিলাম মলিনা—এক হাতে শাঁখ আর এক হাতে ঝড়ের দণ্ড, কোলে বিদ্যুৎমণি। মলিনা, ঘরের ভেতরটা এমন এলোমেলো হল কেমন করে? এমন অগোছালো ত আমার বেরোবার সময় ছিল না।

ভীত দৃষ্টিতে মলিনা চারিদিকে তাকাতে লাগল।

—অনেক ঘুরলাম তোমাকে নিয়ে, কি বল? জল-পাইগুড়ি, কাশী, আগরা, জয়পুর। এখানে এসে বোধ হয় তোমার সব চেয়ে ভাল লাগছে নয়?

—কি বলছেন আপনি?

—কিছুই না, শুধু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার ভাললাগছে কি না।

মলিনা আর কিছুই বল্‌ল না। প্রসন্ন বল্‌ল—আচ্ছা বাক্সটা ওখান থেকে সরে গেল কি করে' বল ত?

আমি সরিয়েছিলাম।

তুমি? ঠিক মনে আছে? আমি সরাই নি?

থর থর করে মলিনা কেঁপে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বল্‌ল, আমিই ত!

—ও; ভাবছিলাম আমিই বুঝি কাপড় বার করে ওখানেই রেখে গেছি!

বাইরে মেঘের গর্জ্জন শোনা গেল। একটি ব্যাকুল উত্তেজনা আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসন্ন তাড়াতাড়ি জান্‌লা-দরজা সমস্ত খুলে দিল।

মলিনা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাসতে হাসতে প্রসন্ন বলল—লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে গেলাম। যে-মেয়েদের মাথায় সিঁদুর নেই তাকে নিয়ে দেশ ঘোরা—অবশ্য আমরা কিছুই গ্রাহ্য করিনে। তবুও মাঝে মাঝে মুস্কিল বাধে বৈকি। আচ্ছা মলিনা?

মলিনা মুখ তুল্‌লো।

—তোমার শরীর কি ভাল নেই? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে—

—কি?

মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে বিদ্যুৎতের আলো দুজনকে চমকে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

—না কিছু না,—আচ্ছা, এর আগে কি ঝড় হয়ে

গিয়েছিল? তুমি কি তখন ছাতের ওপর ছিলে? ছিলে না?

—না।

—ঘরের মধ্যেই? ও।

কয়েকটি মুহূর্তের অতল নিঃশব্দতা হয়ত দুজনেই একবার অনুভব করে' নিল। তারপর ধীরে ধীরে একটা হাত দেওয়ালের ওপর তুলে দিয়ে প্রসন্ন বলল—আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করে তুমি বোধ হয় খুশী হয়েছ? হওনি? থাক্ থাক্, এক কথায় জবাব মুখে না আসে ত আমার কথা এড়িয়ে যেও।—কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে তোমাকে দেখে। তুমি যে ঠিক আদালতের মধ্যে অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে। কেন? কি হল? আমাকে লজ্জা দিও না মলিনা। আমার জন্যে পাশের ঘর ত' বেশ গুছিয়ে রেখেছ, কিন্তু তোমার ঘরের এ কি চেহারা বল ত? বিছানাটার ও রকম অবস্থা কে করলে?

মলিনার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কি আশ্চর্য্য, মাথার চুলের ঝিছিরি হয়েছে দেখ দেখি? আঁচড়াওনি বুঝি? আমি বেরিয়ে যাবার পর এতক্ষণ—

মলিনার ভয়ার্ত্ত মুখ দিয়ে শুধু একটি শব্দ বেরিয়ে এল দেওয়ালের দিকে আর একটু তাকে ঘেঁষে দাঁড়াতে হল—হাতের ভর দেবার জন্যে। মনে হলো হিমাচ্ছন্ন

তার দেহ, হাত-পাগুলি অবশ, মাথাটা এখুনি হয়ত শিথিল হয়ে ঘাড়ের কাছে নুইয়ে পড়বে। ঘর দো'র যেন তার পায়ের তলায় দুলছে।

—মলিনা?

—কি।

—আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তুমি এমনি করে পালিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে? এমন কতদিন? তোমার বয়স যে অল্প! দেশের কাজে নাগতে চাইছ অথচ এমনি করে ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো—আর আমিই বা তোমার সঙ্গে এমন করে কতদিন······ধর তোমার বয়স এখন আঠারো কুড়ি পার হয়ে না গেলে তোমার নিজের ওপর কোনো অধিকারই নেই!

কোনো কথার সঙ্গত উত্তর দেবার শক্তি মলিনার ছিল না। প্রসন্ন হঠাৎ বল্‌ল—বাঃ, তুমি ত' বেশ দেখছি! এদিকে ঘরে একটা আলো জ্বাল্‌তেও তোমার মনে ছিল না? ভুলে গেছলে বুঝি?

সপাৎ করে মলিনার পিঠে যেন চাবুক পড়ল। থর থর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে বল্‌ল এই যে জ্বালি, এতক্ষণ জ্বালবার,—আপনি এলেন কি না!

—অন্ধকারে ছিলে? একলাই থাকতে হয়েছিল এতক্ষণ, না?

বাতিটা হাত থেকে ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। সেটিকে কুড়িয়ে নেবার জন্যে মলিনা আর আঙুলগুলি

একত্র করতে পারছিল না। হাত তার অবশ অচেতন!

প্রসন্ন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জ্বলন্ত বাতিটা তুলে' দু ফোঁটা তেল মাটিতে ঢেলে তার ওপর বসিয়ে দিল।

ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। সকল দরজা জান্‌লা খোলা, প্রদীপের পরমায়ু কতটুকু কে জানে। সেই ক্ষীণ দীপশিখার আলো থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য মলিনা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। মুখে তার ভয়ের বিশ্রী বিবর্ণতা। একটি অপরিচিত আতঙ্কের ছায়া!

আজকে বোধ হয় আর ঝড় উঠল না! এবার আমি বলি এক কাজ করা যাক্—বুঝলে মলিনা? দুঃখও তুমি অনেক পেলে। আমাকে অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করবার জন্য নিন্দাও তোমাকে সইতে হলো। তোমার মত সরল মেয়ের পাওনা সংসারে এর চেয়ে বেশী আর কিছু নেই। বড় যে হতে পেরেছে, নিন্দা আর অপযশও তার তত বড়। চল, তোমার ছোট কাকার ওখানে তোমাকে রেখে আসি। তিনি তোমাকেও চেনেন, আমাকেও জানেন। নৈলে এ অবস্থায় তুমি—একি? মলিনা তোমার ছেঁড়া কাপড়? ছেঁড়া কাপড় পরে আছ?

দেখতে দেখতে মলিনার মুখ শাদা হয়ে এল, সে মুখে আর রক্তের চিহ্নমাত্র রইল না। কাপড়খানি গুটিয়ে সে আর এক পা পিছিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তার চোখ

দুটি কাঁপছে, ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হচ্ছে, পা টলছে, তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, বসে পড়ে' কোথাও মুখ ঢাকতে পারলে সে বাঁচে।

—মলিনা?

—উঁ?

—এ রকম কথা ত ছিল না! আমি চেয়ে দেখবো তোমার জামা-কাপড় ছেঁড়া, তোমার মাথার চুল এলো-মেলো, তোমার গায়ে-মাথায় ধুলো বালি, তোমার জিনিষপত্র, বিছানা-বালিশ ওলোট-পালোট? আজ তোমার এ কি রূপ! প্রসন্ন না হেসেও আবার থাকতে পারল না, তুমি ডাকাতের সঙ্গেও যুদ্ধ করনি, ঝড়ের সঙ্গেও লড়াই করনি, তবে?

দু'হাতে মুখ ঢেকে মলিনা বলে' উঠলো—আমি জানিনে।

সে যেন আর্ত্তনাদ! প্রসন্নর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধ্বক্ ক'রে উঠল। এই বিদীর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। মুহূর্ত্তের জন্য সে একবার বাইরের দিকে তাকালো। সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন বিরাট মহাসাগর স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে! নীচে যতদূর দৃষ্টি যায়, পুরাণদহের প্রান্তর-সীমা অতিক্রম করে অনন্ত অন্ধকার। দিক্‌চিহ্নহীন প্রকৃতির পটের ওপর কে যেন কালী বুলিয়ে দিয়েছে।

এগিয়ে এসে বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রসন্ন তার

কাছে সরে গেল। বল্‌ল—কি? বল শুনি? কাঁদচো নাকি মুখ ঢেকে? এখানেও যে তোমার ভাল লাগছে না তা আজ আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি, কি চেহারা হয়েছে তোমার বল দেখি? কাল এমন সময় ত তোমার এ চেহারা ছিল না।

প্রসন্ন আবার বল্‌ল—কাল কেন, আজ সকালেও তোমাকে এমন দেখিনি। বিকেল বেলা যখন আমি বেরোই···আশ্চর্য্য, এ যে তুমি বদ্‌লে গেছ একবারে! মলিনা, টাট্‌কা ফুলকে মুঠোয় চেপটাতে দেখেছ? পায়ের তলায় মাড়াতে?

ওঃ বুঝেছি, তুমি এ লজ্জার জীবন আর সইতে পারছ না। তাই নয় কি? মলিনা?

মলিনা ফুঁপিয়ে উঠে বল্‌ল—আর কিছু আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। আমি—আমি কিছু বলতে পাচ্ছি না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বল্‌ছিলাম তোমার জন্যেই। তোমার উপর ঝড় যদি বয়ে যায়, আমি জানি ধূলো তোমার গায়ে কিছুতেই লাগবে না. সে মেয়ে ত' তুমি নও।—বেশ অন্য জায়গা আগে থাকতেই আমি বন্দোবস্ত করেছি। চল দিল্লীতে গিয়েই থাকিগে। সেখানে ভাল বাঙ্গালীর হোটেল আছে কি না আজ খবর আসার কথা। আচ্ছা, আমাকে কেউ ডাকতে এসেছিল মলিনা?

ডাকতে? মলিনা অকস্মাৎ শশব্যস্ত হয়ে বলল, কই

না, কই জানিনে ত কিছু? কারুকেও ডাকতে শুনিনি?

কেউ আসেনি? একজনও না?

উঁহু।

মনে করে' দেখ দেখি, আমি বেরিয়ে যাবার পর··· দীনেশ······এসেছিল কি না? দীনেশ গো আমাদের। মনে পড়ছে না দীনেশকে? এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

মুমূর্ষু পক্ষীর মত মলিনার আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল হ্যাঁ, এসেছিলেন।

এসেছিলেন! তাই বল, আমার মতো যে তোমারও কথার ভুল হয়। হ্যাঁ, তাকেই আমার দরকার। তুমি কি বল্‌লে তাকে? বসতে বললে না? আমার না আসা পর্য্যন্ত তাকে ধরে' রাখা তোমার উচিত ছিল যে মলিনা। উঃ সমস্ত মন দিয়ে কেমন করে' যে তার জন্যে অপেক্ষা করে' আছি···অ্যাঁ, দীনেশ তা হলে এসেছিল আমি বেরোবার পর? ঘড়ির কাঁটা ধরে' সে চলতে জানে। হায় হায়, তুমি যদি তাকে আর একটু বসিয়ে রাখতে।

বাইরের আকাশ ততক্ষণে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বিজয়িনী

যুক্তপ্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের একটি বিশাল উপত্যকা ; সেখানে প্রাকৃতিক কারণে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি ফলে চাষীগণ অনেক সময়ে মালিকগণকে বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করিতে পারিত না। এই লইয়া গ্রামের স্ত্রী-পুরুষগণকে অনেক সময়ে তালুকদারের হাতে লাঞ্ছনা ও পীড়ন সহ্য করিতে হইত। গ্রামবাসীগণ ইহার প্রতিকার করিত না, তাহাদের ভাগ্যের প্রতি ইহাই ঈশ্বরের নির্দেশ মনে করিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিত।

একজন ক্ষত্রিয় চাষীর কন্যা, তাহার নাম সত্যবতী, এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠিতেছিল। সে ঘোড়ায় চড়িত, পুরুষের বেশে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া তীর ধনুকের ব্যবহার শিক্ষা করিত, দল বাঁধিয়া তীর্থযাত্রী

গণকে লুণ্ঠন করিয়া অর্থ ও সম্বল হইয়া পলাইতে আনন্দ পাইত। চঞ্চল, নিষ্ঠুর, ও সরল মেয়ে ছিল সত্যবতী; সে ছিল অনেকটা পার্বত্য প্রকৃতির, তাহার আচরণ ছিল বন্য ও দুর্বার।

গ্রীষ্মকাল মহালের খাজনার কিস্তি আদায় করিবার জন্য তালুকদার লোকজন লইয়া গ্রামে আসিয়াছে। যাহারা খাজনা দিতে পারিবে না তাহাদের উপর অত্যাচার চলিতেছে। কাহারও ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, কাহারও কুটিরে বন্য হস্তীকে ছাড়িয়া দিয়া কুটীর বাসী চাষীগণকে উৎখাত করানো হইতেছে। গ্রামবাসীগণ উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া দিক্‌বিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। অত্যাচারের প্রতিবাদ কেহ করিল না।

উপত্যকা হইতে দূরে পার্বত্যপথ বাহিয়া সত্যবতী ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিল। তাহার নিকট এক বণিকের লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীপণের সাক্ষাৎ নাই, তাহার ভিন্ন পথ ধরিয়া পলাইয়াছে সত্যবতী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া এক পাইন বনের ছায়ায় ঘোড়া বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের থলিটি খুলিয়া সে কৌতূহলে ও বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভ্য জগতের সহিত, বিচিত্র মনিহারি দ্রব্যের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। কতকগুলি সুন্দর

বস্ত্র, প্রসাধন ও সুগন্ধী দ্রব্য, নানারূপ খেলনা ও পুতুল, জরির ফিতা, চিরুনী, আংটি ইত্যাদি। আর একটি বস্তু দেখিয়া সে আকৃষ্ট হইল, সেটি আয়না। আয়নায় নিজের মুখ ও রূপ দেখিয়া সে স্তব্ধ হইল, শিহরিয়া উঠিল। আজ সে আবিষ্কার করিল সে স্ত্রীলোক, সে রূপবতী, অপরিমেয় তাহার যৌবন। সত্যবতী দিগন্ত প্রসারিত পাইন অরণ্যের দিকে চাহিয়া কাঁদিল, উপরের আকাশ যেন তাহারই রূপে, তাহারই যৌবন ব্যাকুলতায় ঝলসিয়া যাইতেছে। এই মনে করিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিয়া বেড়াইল।

গ্রামে তালুকদারের অত্যাচার চলিতেছিল, এমন সময় সেখানে অশ্বারোহনে সত্যবতী আসিয়া হাজির হইল। গ্রামের লোক তাহার অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ দেখিয়া স্তম্ভিত, তালুকদারের পাইক, পেয়াদা, লোকজন সত্যবতীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ়। সত্যবতীর হাতে বর্শা, মাথায় ময়ুরের পালক, ললাট জরির অলঙ্কারে ঝলসিত, হাতে কঙ্কণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা। লুণ্ঠিত বণিকের প্রসাধন-সামগ্রীতে সে সুসজ্জিত।

সত্যবতী যুদ্ধ ঘোষণা করিল। হাতে বর্শা লইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া সে গ্রামের দরিদ্র ক্লিষ্ট নরনারীকে উত্তেজিত করিল। বলিল, কে আছ বীর, কে আছ বীরাঙ্গণা, হিংসার পদতলে আত্মবলি দাও, মদমত্ত বর্বর-

তাকে অস্বীকার করো, মৃত্যুকে মেনে নাও, পরাজয় স্বীকার করো না।

তাহার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দরিদ্র, দুর্বল, পদদলিত ও সর্বহারার দল মৃত্যুপণ করিয়া সত্যাগ্রহ করিল।

অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত বলিষ্ঠ সংহত শক্তি দেখিয়া তালুকদারের পক্ষ প্রমাদ গণিল। হাসিমুখে যাহারা মৃত্যুবরণ করে তাহারা ভয়ঙ্কর।

রাজ সরকারে সংবাদ গেল। পুলিশ ফৌজ আসিল। গ্রাম সিপাহী পাহারা বসিয়া গেল।

সত্যবতীর পিতার নিকটে আসিয়া পুলিশ জানাইল, সত্যবতীকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। সত্যবতী সেদিন গ্রামের মঙ্গল মানৎ করিয়া দূর চন্দ্রা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল, তাহার কিছু ভাবান্তর ঘটিয়াছে, ভিতরের সুপ্ত নারীত্ব জাগ্রত হইয়াছে।

স্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে আসিতে আসিতে সে গুণ গুণ করিয়া পাহাড়ী গান গাহিতেছিল। এমন সময় বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সে চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। দেখিল একটা হাঁস পাখী ঝটাপটি করিয়া নদীর চড়ার উপর পড়িল। সে ছুটিয়া গিয়া হাঁসটাকে তুলিল গুলির আঘাতে পাখীটির পাখা ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু মরে নাই। সত্যবতী তাহার সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া হাঁসটাকে স্নান করাইল।

সহসা পিছন ফিরিয়া দেখিল এক রূপবান যুবক দাঁড়াইয়া,—তাহার হাতে বন্দুক।

সত্যবতী কহিল, কে তুমি ?

আমি স্বরষকিষণ।

কেন মেরেছ তুমি এই নিরাপরাধ পাখীকে ?

স্বরষকিষণ বলিল, যে দুর্বল সেই মরে, তার স্থান পৃথিবীতে নেই। আমার শিকার ফিরিয়ে দাও।

সত্যবতী কহিল, দেবো না, অন্যায় করতে তোমাকে দেবো না।

না দিলে জোর ক'রে নেবো।

হাঁসটাকে লইয়া সত্যবতী উঠিল দাঁড়াইল। বলিল, আগে আমাকে মারো, আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও তোমার গুলী ; তার আগে আমি দেবো না। নিষ্ঠুর, উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাসে তোমার পাপশক্তি যে একদিন চূর্ণ হয়ে যাবে, জানো না ?

সত্যবতী কাঁদিয়া ফেলিল।

স্বরষকিষণ তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইল। বলিল, কে তুমি ?

আমি সত্যাগ্রহী সত্যবতী, ক্ষত্রিয় কন্যা। যারা দুর্বল তাদের রক্ষা করাই আমার ধর্ম।

সামান্য একটা পাখীর প্রতি তোমার এই ভালোবাসা কেন, সত্যবতী ?

এই পাখী আমার দরিদ্র দুর্বল দেশের প্রতিমূর্তি। যারা আঘাত করে তারা জানে না, যারা আঘাত সহ্য করে তারাই জানে দুঃখীর প্রাণের ব্যথা।

সুরষকিষণ বলিল, সবল দুর্বলের সমস্যা জগতে চিরকাল রয়েছে। তুমি কেন নিজের জীবন নষ্ট করবে এই সমস্যায়? তোমার কি আর কোনও কামনা নেই?

সত্যবতী সুরষকিষণের দিকে চাহিল।

সুরষকিষণ পুনরায় বলিল, শক্তিমান ও দুর্বল, জীবন ও মৃত্যু, সংহার ও সৃষ্টি—এরা পৃথিবীর আদিম নিয়ম। এই নিয়মের প্রবাহে তুমি যাবে ভেসে? তুমি ছুটবে লক্ষ্যহীন আদর্শের পিছনে পিছনে? তোমার জীবনের সার্থকতা কি, সত্যবতী?

তোমার কথা আমি বুঝিনে।

এই আগম নিগম, এই জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে যে বস্তু অমরত্ব লাভ করে তার খোঁজ কি তুমি জান না?

সত্যবতী চারিদিকে চাহিল। ভয়-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, না!

তার নাম প্রেম, প্রেম সকল বস্তুকে অমরত্ব দান করে। আবার সেই একেই বস্তু ব্যক্তিগত জীবনে সার্থকতা খোঁজে। তোমার এই বয়স, এইরূপ, এই যৌবন—

সত্যবতী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সুরষকিষণ বলিল, ওকি, আমার শিকার ফিরিয়ে দিলে না?

সত্যবতী ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কি করবে তুমি একে নিয়ে ?

স্থরযকিণ হাসিল। বলিল, সুস্বাদু মাংস ভোজনে আনন্দ।

সত্যবতী শিহরিয়া উঠিল। বলিল, নিষ্ঠুর, প্রাণ থাকতে আমি দেবো না।

আচ্ছা, আমি যদি ওকে না মারি ?

তোমাকে বিশ্বাস করিনে।

শপথ করছি।

তবে দিতে পারি। এই নাও।

হাঁসটাকে হাতে লইয়া স্থরযকিষণ বলিল, এই পাখীর প্রাণের বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিতে চেয়েছিলে, এর জীবনের বিনিময়ে তুমি কী দিতে পারো সত্যবতী ?— এই বলিয়া স্থরযকিষণ অগ্রসর হইল।

আমি চাষীর কন্যা—সত্যবতী কম্পিত মুগ্ধ ও জড়িত কণ্ঠে কহিল, আমি দরিদ্র, তোমাকে কী দেবো ?

অভিভূত স্থরযকিষণ নতজানু হইয়া বলিল, ভিক্ষা দাও, অন্নপূর্ণা ?

সত্যবতী আর দাঁড়াইল না, পিছন ফিরিয়া দৌড়াইবার চেষ্টা করিল। সে মুহূর্তে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল। তাহার সিক্ত বস্ত্রের মধ্যে কোথায় ছোট কাঠের আয়নাটি লুক্কায়িত ছিল তাহা পড়িয়া গেল। সত্যবতী থমকিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জায় মরিয়া গেল, চারিচক্ষে দুইজনে চাহিয়া

হাসিয়া উঠিল, তারপর দ্রুতপদে সে পলাইয়া গেল।

সুরষকিষণ আয়নাটি তুলিয়া লইয়া এবং বুকের কাছে আহত হাঁসটাকে লইয়া তাঁবুর দিকে ফিরিয়া গেল।

সত্যবতী জানিত না সুয়ষকিষণই স্বয়ং তালুকদার। পরদিন দেখা গেল পুলিশ ফৌজ বিদায় লইতেছে, গ্রামবাসীরা সত্যবতীকে লইয়া জয়োৎসব করিতেছে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা কানাকানি করিতেছে। তালুকদার খাজনা ছাড়িয়া দিয়াছে, গ্রামের উপর অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করিতেছে, অনেককে আসবাবও উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য কিছু কিছু অর্থও দেওয়া হইতেছে।

সকলেই অহিংস সত্যাগ্রহের জয় ঘোষণা করিল। সত্যবতীকে গ্রামের দেবী বলিয়া মানিল।

অশিক্ষিত মূঢ় জনসাধারণ যে তালুকদারকে অভিশম্পাৎ না দিয়া জলগ্রহণ করিত না, তাহাকেই পরম দয়ালু বলিয়া পূজা করিল। অত্যাচার উৎপীড়নের কথা ভুলিয়া গেল। তালুকদারের লোকজন যে যাহার গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতে লাগিল। সুরযকিষণ শিকারের অছিলায় দুইজন সঙ্গীকে লইয়া নদীর পরপারে তাবু ফেলিয়া রহিয়া গেল। গ্রামের লোক নানারূপ উপঢৌকন লইয়া প্রায়ই তাহকে দেখিয়া যাইতে লাগিল।

বিরহিণী সত্যবতী এ সকল কিছু জানিল না। সে সুরষকিষণকে ভালো বসিয়াছে, তাহার কথা ভাবে, সুখ

চিন্তা করে, গান গায়। সঙ্গিনিগণকে ছাড়িয়া একা একা ঘুরিয়া বেড়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে অরণ্যে অরণ্যে।

এমন সময় এক বিপত্তি ঘটিল। সেই লুণ্ঠিত বণিক সহসা পুলিস পেয়াদা লইয়া গ্রামে চড়াও হইয়া সত্যবতীকে গেপ্তার করিল। গ্রামের লোক বাধা দিল না প্রতিবাদ করিল না, বরং অনেকেই ডাকাতির অপরাধে সত্যবতীকে অপরাধী সাবস্ত করিল। সত্যবতীর পিতামাতা ঘরে ঘরে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজ সরকারের ভয়ে সকলে তাহাদের তাড়াইয়া দিল। যাহাকে এই সেদিন তাহারা দেবী বলিয়া পূজা করিয়াছে আজ বিপদের দিনে গ্রামবাসীরা তাহার কোনো মূল্যই দিল না।

সত্যবতী যাইবার সময় কাঁদিয়া প্রার্থনা করিল, ঈশ্বর এদের অপরাধ নিয়ো না, দারিদ্র্য এরা, মনুষ্যত্বহীন। অশিক্ষায় এরা মূঢ়—এদের তুমি ক্ষমা করো।

সমস্ত গ্রামবাসীরা দাঁড়াইয়া দেখিল, পুলিশ পেয়াদা সত্যবতীকে লইয়া গ্রামের বাহিরে উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূর হইতে দূরান্তে লইয়া গেল।

সত্যবতীর বৃদ্ধ পিতা তুলসীরাম বুক চাপড়াইয়া বলিল, হায়রে ক্রীতদাসের জাতি, হায় জনসাধারণ!

তাঁবুতে আসিয়া অনুচর সংবাদ দিল, সত্যবতীকে গেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে ডাকাতি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।

ঘোড়ায় চরিয়া প্রান্তর ও পর্বত পার হইয়া সুরষকিষণ ছুটিল। অনুচরগণ চলিল।

পুলিশ ফৌজকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সুরষকিষণ তাহাদের থামাইয়া বলিল, এই, খবরদার। আমার গ্রাম থেকে কে মেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যায়?

সত্যবতীর উপর বনিকের একটু লোভ হইয়াছিল। সে বাহির হইয়া বলিল, মেয়ে ডাকাতকে আমরা ধরেছি।

খবরদার, সাবধান।—বলিয়া সুরষকিষণ নিজের পরিচয় দিল। বলিল, আমি তালুকদার, কত টাকা জামিন চাও, বলো?

সুরষকিষণ আসিয়া সত্যবতীর পাশে দাঁড়াইল। সত্যবতী বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতচকিত। দেখিল, সেই অত্যাচারী তালুকদার স্বয়ং সুরষকিষণ।

পুলিসের কর্তার হাতে নিজের নামে ও পরিচয়ে দলিল সই করিয়া প্রচুর পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া সুরষকিষণ সত্যবতীকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিল। বনিকের যে সম্পদ্ ও অর্থ ক্ষতি হইয়াছে তাহার বহুগুণ বেশি তাহাদের হাতে আসিল।

পুলিশের কর্তা প্রশ্ন করিলেন, এই মেয়ে তোমার কে?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রণয়ী ও প্রণয়িণী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। সুরষকিষণের কাতর দৃষ্টি, সত্যবতীর দৃষ্টি ব্যাকুল ও বিহ্বল।

প্রশ্নকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এ মেয়ে তোমার কে?

সত্যবতী সামাজিক অপমানের ভয়ে সহসা সুরষকিষণকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল। সুরষকিষণ বলিল, এ আমামার স্ত্রী।

আকস্মিক উত্তেজনায় যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সত্য নয়। দুইজনে তঁবুতে ফিরিয়া দেখিল, দুইজনের মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান। কে বলিল তাহারা স্বামী-স্ত্রী ? মিথ্যা কথা। যাহাকে অত্যাচারী, রক্তপিপাসু, বর্বর বলিয়া সত্যবতী এতকাল জানিয়া আসিয়াছে, সেই অসুর তালুকদার তাহার স্বামী ? মিথ্যা কথা। সেদিন নদীর ধারে দাঁড়াইয়া এই লোকটার জন্যই তাহার হৃদয় দৌর্বল্য দেখা দিয়াছিল, ইহা অতিশয় ক্ষোভের কথা। না, এই বর্ব্বরকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

সুরষকিষণ বলিল, ভয় করো না আমাকে। নিষ্ঠুর, কিন্তু কাপুরুষ নই। কাছে এসো, ওই ছাখো তোমার সেই হাঁস, ওকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। ও কি, কথা বল্‌ছনা যে ?

সত্যবতী বলিল, আমাকে ছেড়ে দাও।

সবিস্ময়ে সুরষকিষণ বলিল, ছেড়ে দেবো ? পুলিশ-সাহেবকে আমি কি বলেছি মনে আছে ?

সত্যবতী বলিল, তুমি অত্যাচারী, বলদর্পী, দরিদ্রের বুক ভেঙে দেওয়া তোমার কাজ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

তাহার উত্তেজনা দেখিয়া স্বরবকিষণ হাসিল। বলিল, আমি অত্যাচারী বটে কিন্তু কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে হাঁসটাকে মারব না? আমি কি সত্য পালন করিনি? তুমি জানো যে, জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে যা মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়? সত্যবতী, তোমার এই ধর্মটা কেমন? বিপদে প'ড়ে তুমি আমার শরণাপন্ন হয়েছিলে, এখন মুক্তি পেয়ে আমাকে অপমান ক'রে যেতে চাও? এই কি ক্ষত্রিয় কন্যার ধর্ম?

সত্যবতী বলিল, সত্যই আমার ধর্ম। আমি সত্য-বাদিনী, তোমাকে ঘৃণা ক'রে এসেছি, তোমাকে চিরদিনই ঘৃণা করব।

স্বরবকিষণের চক্ষু জলিয়া উঠিল, নিকটে আসিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমিও সত্যপালন করবো, তোমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছি, প্রেমের দ্বারা তোমাকে জয় করবো।

শক্তি প্রয়োগ করবে?

প্রেমের শক্তি সকলের বড়।

তুমি নির্মম, তুমি মনুষ্যত্বহীন, তোমার হিংসার পথে পথে রক্তের দাগ, তোমার প্রেম কোথায়? যদি বলপূর্বক আমাকে নিয়ে যাও তবে কেবল পাবে আমার প্রাণহীন দেহ, প্রেমহীন জীবন। তোমার ঐশ্বর্যের অহংকারের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না, তোমার মদমত্ততার

পায়ে আমাকে দাসখৎ খেলাতে পারবে না, আমার যোগ্য হওয়ার সাধনা তোমার নেই।

দাঁড়াও, যেয়ো না। তোমার যোগ্য হওয়ার জন্য কী করতে হবে?

তপস্যা করো, তবে এই প্রশ্নের উত্তর পাবে। আমি চললাম।

সত্যবতী চলিয়া গেল, তাহাকে বাধা দিবার সাহস সুরযকিষণের হইল না। কেবল পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল, যে গ্রামবাসীরা তোমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল আবার তাদেরই কাছে ফিরে চলেছ?

তারা অজ্ঞান তবু তারা আমার আপন মানুষ।—এই বলিয়া সত্যবতী দর্পভরে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে লোক মুখে নানা কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা সত্যবতীর নামে কলঙ্ক রটনা করিয়াছে পুলিশের হাতে পড়িয়া তাহার জাতি নষ্ট হইয়াছে,—তালুকদারের তাবুতে গিয়া সে নারীধর্ম বিসর্জন দিয়াছে।

সমাজপতি, পণ্ডিত, শাস্ত্রী, গ্রামের প্রবীন নরনারীগণ তাহাকে গালি দিল, সমাজ চ্যুতি করিল। সত্যবতীর পিতামাতার উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল।

সুরযকিষণ তাহার খাস মহলে ফিরিয়া গেল। তাহার জীবন সত্যবতীর অভাবে বিস্বাদ বোধ হইল। ধনসম্পদের প্রতি তাহার মোহ হ্রাস পাইতে লাগিল।

সে দান খয়রাতের দিকে মন দিল। জীবনে তাহার পরিবর্তন ঘটিল।

তাহার পুরুষানুক্রমিক জড়োয়া জহরৎ, আসবাব সজ্জা, আমানতি অর্থ—একে একে সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রজাগণের হিতার্থে সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ব্যবহারিক জীবনের সকল বিলাসিতাকে বিসর্জন দিল। একমাত্র পুত্রের এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিধবা বৃদ্ধা মাতা অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।

বন্ধুরা আসিয়া তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সুরষকিষণ বলিল, ভালো লাগে না।

তুমি নিজের এইরূপ সর্বনাশ কেন করছ? পিতৃপুরুষের সকল সম্পদ তুমি কেন নষ্ট করছ? কী চাও তুমি?

সুরষকিষণ বলিল, ঐশ্বর্য্যের অহংকার চূর্ণ হোক, এই আমি চাই। আমি চাই খ্যাতিহীন পরিচয়হীন জীবন,—আমি চাই আমার সকল সম্পদ যেন সর্বসাধারণের সেবায় লাগে।

তুমি একথা জানো সর্বসাধারণের সেবা যারা করে তারা ধনী, ভিখারী নয়? ভিখারীর ত্যাগও নেই, সেবাও নেই—তারা লক্ষ্মী ছাড়া!

বন্ধুদের যুক্তি সুরষকিষণ মানিল না। বিধবা মাতার জন্য যৎসামান্য রাখিয়া সে যথা সর্বস্ব জনহিতার্থে বিলাইতে লাগিল। ইহাতেও হইল না, একদিন সে তাহার প্রিয়

অনুগত ভৃত্য মহাদেওকে লইয়া পথে বাহির হইল। রাজপুত্র পথের ভিখারী হইয়া চন্দ্রা নদীর ধারে গিয়া কুটীর বাঁধিল। সেই হাঁসটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। এই রাজহংস তাহাকে নবজীবনের বার্তা আনিয়া দিয়াছিল। এই হংস তাহাকে ভালো বাসিতে শিখাই-য়াছে, ইহা যেন তাহাদের উভয়ের প্রেমের সেতু। বিরহী সুরযকিষণ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিছু ভালো লাগে না। নদীর ধারে গিয়া বসে, জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁশী বাজায়।

ওদিক বহু অত্যাচার করিয়াও গ্রামের লোক খুশি হইল না, একদিন তাহারা সত্যবতীর ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। বৃদ্ধ পিতাকে সে বাঁচাইতে পারিল বটে কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে সে লেলিহান অগ্নিশিখার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিল না। সব পুড়িয়া ছারখার হইল।

সত্যবতী পিতার হাত ধরিয়া পথে নামিয়া আসিল। আগুনের ঝলকে তাহার পিতার চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

হিমালয়ের এক তীর্থপথে মেলা উপলক্ষ্যে মহাদেওকে সঙ্গে লইয়া সুরযকিষণ গিয়াছিল। ফিরিবার পথে দেখিল এক অন্ধ ভিখারীর হাত ধরিয়া একটি ছিন্নবাস-পরিহিত মেয়ে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। ভিক্ষা দিতে গিয়া অকস্মাৎ সুরযকিষণ সত্যবতীকে চিনিতে

পারিল। চারি চক্ষের মিলন হইল। সত্যবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

পথের মাঝখানে নতজানু হইয়া বসিয়া সুরযকিষণ অঞ্জলি পাতিয়া বলিল, দেবি, আজ আমাকে ভিক্ষা দাও

সত্যবতী তাহার দুই হাত ধরিয়া তুলিল। বলিল। আমার দরিদ্র দেশকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি তার দুঃখ ঘোচাও।

বিবাহের সংবাদ প্রচারিত হইল। দরিদ্র নারায়ণ দলে দলে আসিল। দূর দূরান্তর গ্রাম হইতে দরিদ্র দুঃখী প্রজাদল আসিয়া উৎসবে যোগ দিল যাহারা কলঙ্ক রটাইয়াছে, ওঅত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছে ঘর জ্বালাইয়াছে,—তাহারাও আসিল।

উৎসবে সবাই মত্ত, এমন সময় জ্যোৎস্নরাত্রে স্বামী স্ত্রী চন্দ্রানদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যবতীর কোলে সেই প্রিয় রাজহংস। একদিন এই হংস আপন রক্ত দিয়া তাহাদের মিলনের পথে সাহায্য করিয়াছিল এখন তাহার ক্ষতস্থান নিরাময় হইয়াছে, সে উড়িতে পারে।

সুরযকিষণ বলিল, ওকে উড়িয়ে দাও, অসীম বিশ্বের দিকে আমাদের এই মিলনের সংবাদ প্রচার করুক।

সত্যবতী হাসিয়া সেই রাজলংসকে জ্যোৎস্নালোকে উড়াইয়া দিল। দুইজনে সেইদিকে চাহিয়া রহিল,

দেখিল আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িতে উড়িতে সেই রাজহংস পুনরায় তাহাদের কুটিরের লতা বিতানের ধারে আসিয়া বসিল। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

বন্ধু

পথের ভিড়ের ভিতর থেকে ফণী হাতছানি দিয়ে বন্ধুকে ডাক্‌লে! ছকু এসে দাঁড়াল হাঁপাতে হাঁপাতে, চোখে মুখে তার খুসি আর উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে হাসতে হাসতে বললে, বেকসুর খালাস!

ফণী সাগ্রহে বললে, একদিনেই মামলা শেষ?

হ্যাঁ রে, কেস্ যে দাঁড়ায় না! টাকা নিয়ে রসিদ দিয়েছিলুম, সুদের কথা উল্লেখ ছিল না, টাকা যে ফেরৎ দিতে হবে তার কড়ার কোথায়? মামলা ডিস্‌মিস্‌ড্‌!

হাকিম কি বললে?

বললে, আসামী নির্দোষ! বলতে বলতে ছকু হাসলে; পুনরায় বললে, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত একথাটা আর আমাকে কেউ বলেনি। শোন্ ফণি, তুই কিছু ভাবিসনে, তোর গয়না চুরির কেস-ও আমি ফাঁসিয়ে দেবো দেখিস্—

ফণী চিন্তিত মুখে তার এই আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। স্কুল থেকে কলেজ-জীবনে তারপর এই দীর্ঘ বেকারবৃত্তিকালে বহু অসাধ্য সাধন তারা উভয়ে করেছে, তবু ছকুর আজকের এই অভয়-বাণীতে ফণী আশ্বস্ত হোলো না, আপন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ক্লিষ্টকণ্ঠে সে বললে, পারবি ? ওরা যে সাক্ষী দিচ্ছে সব হাতে হাতে, কেউ মিথ্যে বলবে না ; তা ছাড়া আমার দাগ আছে যে দুবার—

ছকু বললে, ওইটেই যা মুস্কিল। প্রিভিয়স্ কন্‌ভিকশন্ শুন্‌লেই শ্লা হাকিম যায় চ'টে। আয় এখন চল্। ব'লে সে ফণীর কাঁধের উপর দিয়ে একটা হাত জড়িয়ে চল্‌তে লাগল। বললে, ভাবনা কি রে, যতক্ষণ আছি। ততক্ষণ—জানিস এক ব্যাটা ভালো উকীলের সঙ্গে আধাআধি বন্দোবস্ত করেছি?

কা'র জন্যে ?

শ্লা, তোর জন্যে রে।

মাইরি ?

কালীর দিব্যি !

দুজনে চলতে লাগল। ফণী এক সময়ে বললে, আর যদি আমার জেল্ হয়।

তাহ'লে খেটে আসবি। এক বছরের বেশি হবে না।—ব'লে পরম নিশ্চিন্ত মনে ছকু সিগারেট্ টান্‌তে টান্‌তে চল্‌ল।

১০

বল্‌লে, হ্যাঁ, একটু কষ্ট হবে আমার তোকে ছাড়তে,—ও কিছু না। এই ত সেবার সাল্‌কে ডাকাতিতে আমাকে জড়িয়েছিল, তুই ছিলি নে? ওসব ভাবতে গেলে চলে না। আমি ত তখন মামার বাড়ীতে চ'লে যাবো।

ফণী ফস ক'রে বললে, মামার বাড়ীতে? আমি জানি তোর সেখানে কী মতলব। আমাকে লুকোচ্ছিস কেন?

ছকু বললে, যা বাজে বকিস নে। আর তুই সেবার জেলে যাবার পর আমি যে তোর মাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিতুম?

ফণী বললে, আমার টাকা ছিল যে তোর কাছে তখন?

ওঃ ভারি টাকা! ধর্ম্মপথে রোজকার ক'রেছিলি, কেমন? বলতে লজ্জা হয় না! না দিতেও ত পারতুম!

ফণী বললে, নিজেদের মধ্যে 'অনেষ্টি' রাখতেই হবে।

ছকু একবার পথের দিকে চেয়ে বললে, রাখা কঠিন। ভদ্রলোকের ছেলে আমরা, একথা প্রায়ই ভুলে যাই। চল্‌ আজ কার্নিভ্যালে যাওয়া যাক্‌।

সমস্ত পথটা তাদের যে আলোচনাটা চল্‌তে লাগল সেটা কেবল ফন্দী-ফিকিরের কথা। লোকের পকেট্‌ কাট্‌তে হ'লে আজকাল কাঁচির চেয়ে কাঁচেই সুবিধা, হঠাৎ ধরা পড়লে বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত, কারণ তা'তে গাম্ভীর্য্য আসে। দেশী

মদের সঙ্গে ফলের আচার কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করলে বস্তুটি উপাদেয় হয়। বিনা টিকিটে ট্রেণ ভ্রমণ করতে গেলে আজকাল 'ক্রু-সিষ্টেমটাকে' উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার।—আজ পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত এ ছাড়া তাদের আর কিছু বিশেষ আলোচনা হয়নি। এটা ওদের বন্ধুত্ব। উভয়ের সম্বন্ধে উভয়ের একটি পরম নিষ্ঠা ছিল। রোগে দুঃখে বিপদে দারিদ্র্যে এই নিষ্ঠা ও এই শুচিতায় কোথাও ফাট্‌ল ধরেনি; নির্ভরতায় ও বিশ্বাসে সম্পর্কটা ছিল খাঁটি। একজন আর একজনকে কখনো প্রবঞ্চনা করেনি।

কার্নিভ্যালে এসে পৌঁছুল দুজনে, বেলা তখন অপরাহ্ণ। এখানে বিপুল জনতা, নানাদিকে নানাখেলা। দুজনে একটা জায়গা নির্ব্বাচন ক'রে নিলে। কথা রইল, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু রাত আটটা বাজলেই এই চিহ্নিত জায়গাটিতে একজন আর একজনকে খুঁজে নেবে। এই স্থির ক'রে দুজন দুদিকে চ'লে গেল।

কোথাও সিনেমা শো চল্‌ছে, কোথাও একজিবিশন্ কোথাও জিম্‌নাষ্টিক্, কোথাও বা ম্যাজিক্। ছকুর পকেটে অর্থ ছিল কম, কিন্তু তাকে কোনো বিষয়েই নিরুৎসাহ দেখা গেল না। নিরুৎসাহ জীবনে সে কোনো কিছুতেই নয়। একে একে আজ পর্য্যন্ত সকল খেলাই সে খেলেছে। হার মানেনি কোথাও, জয় করেই সে এসেছে। এখানে ফণীর সঙ্গে তার প্রভেদ অনেকখানি। ফণীর কৃতিত্ব কম,

ভয়কাতর, প্রখর হিতাহিতজ্ঞান সম্পন্ন, তাকে নিয়ে কোনো দুঃসাহসের কাজে নামা যায় না। সেখানে ছকু একা। ছকু ছুটেছে অন্ধের মতো; পিছনে সে তাকায় না, বিবেচনা তার নেই! পুলিশে ধরা প'ড়ে আজ পর্য্যন্ত সে অন্তত পঞ্চাশবার বাপের নাম বদলেছে.—ফণীর ওটা আসে না। ফণী প্রকাশ ক'রে ফেলে সত্য কথা, তাই সে মার খায়, সে শাস্তি পায়। ফণীর আছে বুড়ো মা, তার দিকে সে তাকায়। ছকুর কেউ নেই, তাই সে দুর্দ্ধর্ষ। বছর দুই আগে একটা স্ত্রীলোককে সে খুন করেছে কিন্তু আজো ধরা পড়েনি। খুন করতে তার বাধে না, কিন্তু ফণীর বাধে, ফণী ছুরি তুলতে ভয় পায়। ভয় পায় বটে কিন্তু পাপের প্রকৃতি তার অনেক প্রবল।

রাত আটটার সময় যথাস্থানে দুজনের দেখা হোলো। ফণী হাতের উলটো পিঠ ফিরিয়ে ছকুকে দেখালে একটা মণিব্যাগ, দেখিয়ে হাসলে। ছকু বললে, তোর ধৈর্য্য কম নয়. ছোট বেলায় পকেট মারতে ভালো লাগত, এখন বড় হয়ে ওসব ..কত আছে দেখলি ?

সাড়ে চার টাকা।

ধ্যেৎ তেরি। অতগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, একটারও গা থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারলিনে ?

ফণী বললে, ওসব তোর আসে, আমি পারিনে মাইরি।

ছকু বললে, সাড়ে চার টাকায় কী হবে? আয় দেখি, একটু বালা খেলে যাই। অন্তত সাতটা টাকা তুলতে পারলিনে! তোর হাত আজকাল বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে ফণে।

জুয়ার কাছে দুজনে এলো। তার ভেতর থেকে একটি ছোকরা মুসলমান ব'লে উঠল সেলাম লিজিয়ে ছকুবাবু। ক্যায়সা হয় আজকাল? আও খেলো, বালা লেও।

সে এক জটিল খেলা। সাধুতার চেয়ে কৌশল বড়, ভাগ্যের চেয়ে বড় চাতুর্য্য। ফণী অন্য শিকারের সন্ধানে আর একবার টহল দিয়ে আসতে গেল, মণিব্যাগটা রইল ছকুর হাতে। ছকু খেলা চালাতে লাগল।

আধঘণ্টা বাদে প্রায় দেড়টাকা খরচ হয়ে যাবার পর হিসেব ক'রে দেখা গেল, খরচ বাদে মাত্র আটআনা লাভ দাঁড়িয়েছে। ছকু বলেই এটা অসম্ভব হোলো। টাকা পয়সাগুলো মণিব্যাগে তুলে নিয়ে ছকু বললে, আর নয় ভাই ইব্রাহিম, ন'টা বাজে।

ফণী শুক্‌নো মুখে ফিরে এলো। ইব্রাহিমের কাছে বিদায় নিয়ে দুই বন্ধু পথে বেরিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল আলোর প্লাবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের স্নিগ্ধ অন্ধকার দুজনের বেশ ভালো লাগল। একটা বাড়ীর রোয়াকে ব'সে ছকু বললে, আয় একটু জিরিয়ে যাই, বড় খাটুনি গেল সারাদিন। এবার কোথায় যাওয়া যায় বলত?

পাঁচ টাকার ওপর আছে। যেখানে খুশি চল।—ব'লে ফণী তার পাশে ব'সে একটা সিগারেট ধরালে।

সিগারেটটা ফণীর হাত থেকে এক সময় নিয়ে একটা টান্ দিয়ে ছকু বললে, তোর মা সকালে আমাকে গাল্ দিচ্ছিল কেন রে?

ফণী হাসতে লাগল। বললে, মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

কেন?

সেই যে মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছিল, সে সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে। মা বলে, তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব তারা টের পেয়ে গেছে।

ওঃ এই কথা। শ্লা, এদেশে ছেলের বিয়ের ভাবনা? ক'টা বিয়ে করতে চাস বল ত? ভাবসনে, আমি তোর বিয়ে দিয়ে দেবো।

ফণী বললে, বিয়ে ফিয়ে করব না। খাওয়াবো কি বল্ ত?

পকেট মেরে খাওয়াবি?

ছি ছি, ওকথা বলিসনে ছকু।

ছকু বললে, তুই দেখছি ধার্ম্মিক হয়ে উঠলি। আরে শোন্ শোন্, আমার সেই মাসতুতো বোন যমুনাকে মনে আছে?

খুব আছে, সেই ত গৌরীবেড়ে গিয়ে তার ওখানে মাংস খেয়ে এসেছিলুম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। তার একটা ননদ এসেছে মাইরি, বেড়ে দেখতে মেয়েটাকে। তুই দেখলে পাগল হয়ে যেতিস।

মাইরি ?

কালির দিব্যি ! মেয়েটার নাম লীলা। আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চায়, আমাকে ওদের খুব পছন্দ।

ফণী তার মুখের দিকে তাকালো। ছকুকে পছন্দ হবার কারণ আছে বৈকি। সে সুপুরুষ তা'তে আর সন্দেহ নেই. চওড়া বুকের ছাতি, চোখ দুটো বড় বড়, মুখের হাসিটা ভালো। গায়ে অসীম শক্তি। হ্যাঁ এই হ'লেই মেয়েরা খুশি। ফণীর মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, তুই কি বললি ?

ছকু বললে, তোর কথা আমি বলেছি। বললুম, ফণীর সঙ্গে লীলার বিয়ে দাও যমুনাদি। তোর সঙ্গে ত মেলে রে, তুই চাটুয্যে, আমি গাঙ্গুলী। যে বিয়ে করবে, লীলার বাবা তাকে একটা ভালো চাকৃরি করে দেবে।

ফণী বললে, তোকে ছেড়ে কি আর আমাকে ওদের পছন্দ হবে ? তোকেই ওরা ভালো রকম জানে। আর তাছাড়া আমার গলায় এত বড় একটা মামলা ঝুলছে।

ছকু বললে, কাল একবার যাবি সেখানে ? আরে, আমার এখন বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, আমি চুপি চুপি যমুনাদিকে বলব তোর কথা।

বললেই কি আর হয়? কাকার জামিনে খালাস আছি, কাকা কি আর বিয়েতে এখন রাজি হবে?

ধ্যেৎ তেরি কাকা। চল্, আজ একটু ঘুরে আসা যাক্।—ব'লে ছকু উঠে দাঁড়াল। .

সে রাত্রে দুই বন্ধুর কাহিনীটা শ্রুতিকটু। চরিত্র তাদের ভালো নয়, তারা সব জানে। পল্লীবিশেষে একটি মেয়ের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছু মদ্য এবং সামান্য আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে তারা দুজনে একটা বাড়ীতে গিয়ে উঠল। এবং রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত আপন আপন হাতে তারা কলঙ্ক মাখামাখি করতে লাগল।

এরপর দিন আষ্টেক পরে আবার তাদের গৌরী-বেড়ের কথা মনে পড়ল। সেদিন বিকালের দিকে তারা যমুনাদের বাড়ীর দরজায় হাঁটতে হাঁটতে এলো। নিজেদের জীবন তাদের যাই হোক, কিন্তু তারা যে, গৃহস্থ ভদ্রবংশের সন্তান—আত্মীয় স্বজনের দরজার কাছে এলে একথা তাদের মনে পড়ে যায়। তাদের আর সহজে চেনবার উপায় থাকে না।

ছকু বললে, এখানে একটু দাঁড়া, আমি ডাকব তোকে ভেতর থেকে।—বলে সে ভিতরে গেল।

ফণী রইল দাঁড়িয়ে। অবাধ্য অসংযত চক্ষু। তার চোখ কখনো উপরের বারান্দায়, কখনো নীচের বৈঠক-খানার ঘরের নানা লোভনীয় জিনিষ পত্রের উপর ঘুরে আসতে লাগল। ছোটবেলা থেকে একটা কথাই কেবল

মনে পড়ে। অতিথি এবং অভ্যাগত হিসাবে যেখানেই তারা দুই বন্ধু মিলে গিয়েছে, সেখান থেকে রিক্ত হস্তে কখনো ফেরেনি। কিছু না পারলেও পুরনো জুতোর বদলে নতুন জুতো জোড়া অবশ্যই এনেছে। তারপর বড় হোলো। মেয়েরা যখন থেকে তাদের দেখে লজ্জায় গায়ে কাপড় টেনে দিতে লাগল, তখন থেকে জাগল মেয়েদের প্রতি অদ্ভুত আসক্তি। তাদের সে চেহারা ভয়ানক। ভদ্র বংশের ছেলে তাই সুবিধা ছিল অনেক বেশি। গ্রহণে ভলাণ্টিয়ারি, বন্যাদুর্ভিক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া প্রদর্শনীতে দ্বাররক্ষা, স্বদেশী সভাসমিতিতে তদ্বির করা ইত্যাদি নানা উপায়ে বহু মেয়ের সংস্পর্শে তারা আসবার উপায় ক'রে নিয়েছে, কোথাও কোথাও কৃতকার্যও হয়েছে।

একটি চাকর এসে ফণীকে ডাক দিল। ফণী ভিতরে গিয়ে দেখলে উপরের সিঁড়িতে ছকু দাঁড়িয়ে। দুজনে কাছাকাছি হতেই ছকু চুপি চুপি বললে, দেখিস, মুখ দিয়ে যেন খারাপ কথা বেরিয়ে পড়ে না— সাবধান

যমুনাদি উপরের দালানে দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, এসো ফণী ভাই, ভালো আছ ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ব'লে ফণী যমুনাদির পায়ের ধুলো নিলে। যমুনাদি তার হাত ধরে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন

এখানকার সব ভালো, সব নতুন। পথের বাইরে যেমনই হোক, কিন্তু কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দর মহলে ঢুকলে নিজেদের প্রকৃত চেহারাটা যেন দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় নিজেরা যেন মলিন, বড় ভয়ঙ্কর। কিসের যেন গুরু ভার সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে তারা যেন দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। ভাবতে গেলে বুকের ভিতরটা ধক ধক করে।

যমুনাদি নানারকম আহারের আয়োজন ক'রে এক সময় বললেন, তোমরা ভাই চিরকেলে অবাধ্য, এখন একটু শান্ত হয়েছ ?

ফণী হেসে বললে, এখনো হয়নি যমুনাদি।

না না ওসব কথা বলোনা। এবার জ্ঞান হয়েছে। বিয়ে কর, চাকুরি কর—সংসার হোক। আর কদ্দিন ঘুরে বেড়াবে ভাই ?

ঘন নিশ্বাস ফেলে ছকু ব'লে উঠলো, আর হয়না যমুনাদি. অনেক দেরি হয়ে গেছে। জোড় জোড় খুলে ঘোড়া ছুটেছে, ভয়ানক ভাবে থামবার আগে আর হয়ত তাকে সংযত করা যাবে না। মুখে ফণী বললে, বেশ ত, আপনারা রয়েছেন যখন—

যমুনাদি বললেন, হ্যাঁ, ছকুর ত বিয়ে দেবো লীলার সঙ্গে, তোমার জন্যেও একটি পাত্রীর সন্ধানে রইলুম। বিয়ে না করলে কি চলে ভাই ?

এটা যে সৌজন্য, এটা যে কেবল মাত্র সাধারণ ভদ্রতা —এ ফণীর কানেও বাজল। এমন সৌজন্য সে অনেক দেখেছে, জীবনে বহু হিতৈষীর সংস্পর্শে বহুবার তাকে আসতে হয়েছে। মুখ সে তুললে না, কেবল একটু হেসে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল। ছকু তার গা ঠেলে দিয়ে এক সময়ে বললে, খা রে ফণে—

এই যে। ব'লে ফণী খাবারের রেকাবটা হাতে তুলে নিলে। এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী এসে দাঁড়াল তাদের ঘরের দরজায়। বললে, বৌদিদি ডাক্‌ছিলে ?

হ্যাঁ ভাই, একটু দাঁড়াত এদের খাবার কাছে, আমি একবার নীচে ছেলেদের খাবারটা বেড়ে দিয়ে আসি।— ব'লে যমুনা উঠে নীচে নেমে গেল।

ছকু হাসিমুখে একবার মেয়েটি ও একবার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিলে। তারপর বললে, লীলা, এই আমার বন্ধু ফণী। তুমি বোধ হয় আগে একে দেখোনি, না ?

না। ব'লে লীলা একটি ছোট নমস্কার করলে। এবং নমস্কারের যে প্রতিদান দিতে হয় একথাটা ফণীর মনেই এলো না। সে কেবল অবাক হয়ে এই মেয়েটির কমনীয় রূপের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

চা টা কেমন হয়েছে রে ফণি ?

আচমকা সাড়া দিয়ে ফণী বললে, হ্যাঁ, বেশ ভালই। উনি চা, খাবেন না ?

লীলা বললে, না, বিকেলের দিকে চা আমি খাইনে।

খাবার ?—ব'লে ছকু হেসে তার দিকে নিজের থাল'টা বাড়িয়ে দিলে।

ধন্যবাদ, আপনি গিলুন মশাই।—ব'লে লীলা হাসি মুখে থালাটা আবার ছকুর দিকে ফিরিয়ে দিলে।

সামান্য হাসি আর পরিচয়—তবু বন্ধুর এই সৌভাগ্যে ফণী ঈর্ষান্বিত হোলো। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল, মনটা রি রি করে উঠ্‌ল। আর সকলের চেয়ে বেশি সে ভাবল, এই তরুণী মেয়েটির কথা। এই শ্রী, এই শুচিতা, এই দেবী প্রতিমা নিন্দিত রূপ, এর পরিণাম কি ছকুর স্ত্রী হওয়া ? এমন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জীবন এত সহজে নষ্ট হয়ে যাবে ! বুকের ভিতরটা যেন ভয়ানক গ্লানিতে ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল।

অনেক গল্প গুজবের পর বিদায় নেবার সময় হোলো যমুনা পাশের ঘরে গিয়ে কিছু পারিবারিক আলাপ সেরে নিচ্ছিল ছকুর সঙ্গে, এবং সেই সময় একটু ফাঁক পেয়ে ফণী বললে. শুনলুম, ছকুর সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে।

লীলা চুপ ক'রে হাসলে।

ফণী বললে, আমি ওর বন্ধু······আমি, আমি বলতে পারিনে সব কথা—কিন্তু······

ফণীর গলা কাঁপছিল। পুনরায় বললে, তবু ব'লে রাখছি ছকুর চরিত্র ভালো নয়—পৃথিবীতে এমন পাপ নেই যে ও করেনি। মাতাল, বেশ্যাসক্ত······

আপনি কী বলছেন, ফণীবাবু ?

একটিও মিথ্যে বলছিনে। ওর মতন আমারো চরিত্র মন্দ, ওর চেয়েও মন্দ! তবু এটা আমার সইছে না যে আপনার জীবনটা নষ্ট হয়!—বলতে বলতে দরদর ধারে ফণীর চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে এলো। এ অশ্রু হয়ত ঈর্যার, আত্মগ্লানির, হয়ত বা বন্ধুর বিরুদ্ধে জীবনে প্রথম বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে—এ অশ্রুতে তার বেদনাও নিহিত ছিল।

এমন সময় নীচে থেকে ছকুর ডাক শুনে চক্ষের পলকে মুখ মুছে ফণী লীলাকে একটা নমস্কার দিয়ে নেমে গেল। যমুনা তাদের সস্নেহে বিদায় দিলেন।

——ঃ০ঃ——

বন মানুষের হাড়

:

হেমন্ত রাত্রির কুয়াসায় আর ধোঁয়ায় কাশীর পথঘাট আচ্ছন্ন। দিনের আলোয় যাহা চিনিয়া রাখি, যাহা পরিচিত মনে করি, সহসা রাত্রির এই ধূমল কুয়াসার রহস্যময় আবরণে তাহা অস্পষ্ট ও অচেনা বলিয়া ভুল ঘটে।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে কালীতলা হইয়া বাঙ্গালী-টোলার পথ দিয়া আসিতেছিলাম। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। গলির পথের দুইধারের দোকান-পাট বন্ধ, দু' একটি যাহা খোলা ছিল তাহাও সন্ধ্যার পরে বন্ধ হইয়া গেছে। সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত জনতায় ও কোলাহলে যে পথটি মুখর ও প্রাণময় হইয়া থাকে,

রাত্রিকালে সে-পথ ধীরে ধীরে জনমানবহীন বৈরাগ্যে শ্মশানের শেষ প্রহরের মতো নিঃসাড় হইয়া আসে। একাকী পথ চলিতে চলিতে ভয়ার্ত্ত চক্ষে এদিক ওদিক তাকাইতে হয়।

দেবনাথপুরা পার হইয়া আসিবার পর দেখিলাম, গোপাল-বাড়ীতে কীর্ত্তনের আসর ভাঙিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের দল বাহির হইয়া হিম লাগার ভয়ে গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়া যে যার পথে চলিতে লাগিল। আলো দেখিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমিও পুনরায় আমার পথে চলিতে লাগিলাম। ভেলুপুরার থানা ছাড়াইয়াও যাইতে হইবে, পথ এখনও অনেকটা বৈকি। আমি পদক্ষেপ দ্রুত করিয়া দিলাম। কিছু দূর আসিয়া আর একবার থমকিয়া ভাবিলাম, পাঁড়ে হাউলীর বড় রাস্তা দিয়া যাইব অথবা কেদার হইয়া হরিশচন্দ্র দিয়া গেলে আমার পথ সহজ হইবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়িবার জন্য পাঁড়ে হাউলীর গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম।

কীর্ত্তন-আসরের যে সমস্ত নরনারী এইদিকে আসিতেছিল তাহাদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা ও পদশব্দ একে একে এখানে ওখানে মিলাইয়া গেল। এক আধজন আমারই পিছনে পিছনে আসিতেছিল, আমার মতো তাহারাও অন্ধকারে উঁচু নীচু পথ ঠাহর করিয়া চলিতে-ছিল। কিন্তু অনেক দূর আসিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের

পাঁচিলটা পার হইয়া আমার যেন একটু সন্দেহ হইল; বড় রাস্তার একটা আলোর রশ্মি অন্ধকার গলির বহুদূর অবধি আলোকিত করিয়াছে,—তাহাতেই দেখিলাম আমারই আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করিয়া যে স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ ধরিয়া আসিতেছিল সে আর কোথাও বাঁক লয় নাই, বড় রাস্তা পর্য্যন্ত আমারই সহিত সে আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এমন হইয়াই থাকে। সঙ্গী না থাকিলে অনেক মেয়েপুরুষ অপরিচিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করিয়া অন্ধকার গলি ঘুঁজি পার হইয়া যায়। এমন কাজ আমিও অনেকবার করিয়াছি। এই শিবস্থানে কাল-ভৈরবের নৈশচক্রান্তের গল্প শোনা আছে, রাত্রির কাশী শহরের গা-ছমছমে অন্ধকারে অনেকেই সতর্ক হইয়া পথ চলে।

বড় রাস্তায় পড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম, দুই পাশে দুই একটা বাগানবাড়ী পার হইলাম, কালীবাড়ীর পাঁচিল পার হইয়া চৌআনির কাছাকাছি আসিয়াও একবার পিছনে লক্ষ্য করিলাম, স্ত্রী-লোকটি ঠিক সেই ভাবেই অনুসরণ করিতেছে। তাহার মুখ দেখা যায় না, বয়স ঠাহর করা যায় না, রঙিন চাদরে আবৃত একটা ছায়ামূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

সহসা বাঁহাতি একটা পানের দোকান পাইয়া একটু স্বস্তি বোধ করিলাম। পান কিনিবার জন্য দোকানের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং পান কিনিয়া বোঁটায় চূণ

লইয়া জর্দ্দা চাহিয়া পয়সা চুকাইয়া যখন আবার ফিরিয়া চাহিলাম, সহসা সভয় বিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, সেই স্ত্রীলোকটি আলো বাঁচাইয়া ফুটপাতের একপাশে এতক্ষণ আমারই দিকে চাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু মুখের চেহারা না দেখিতে পাইয়া আমি একটু বিব্রত বোধ করিলাম। বিদেশে আসিয়াছি, এখানে আমার আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত কেহ নাই, কোনো স্ত্রীলোকের সহিতই আমার চেনা নাই, অথচ বেশ বুঝিলাম আমারই জন্য সে দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোক আমাকে অনুসরণ করিবে অথবা এমন করিয়া গায়ে পড়া একটা প্রণয়কাণ্ড ঘটিবে —ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে বয়স আমি পার হইয়া আসিয়াছি।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি বোধ করি অসীম সাহসে ভর করিয়া এইবার আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। চিনিতে পারিলাম না, কেবল সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

—চিনতে পারলে না, মৃগাঙ্ক? তোমার সঙ্গে আসচি সেই গোপালবাড়ীর দরজা থেকে। চিনতে পারলে না? দেখো ত' ভাল ক'রে?

বলিলাম, কই, না? কে আপনি বলুন ত?

সে কহিল, তেরো চোদ্দ বছর। মনে থাকার কথা নয় বটে। আমি কিন্তু দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

বলিলাম, ক্ষমা করবেন, আমার কিছুই মনে পড়ছে

না। অবশ্য আপনি আমাকে চিনেছেন, আমার নাম মৃগাঙ্ক।

আমি যে যোগমায়া, মনে নেই? সেই যে বেলেঘাটায় তোমাদের বাড়ীর পাশে ভাড়া থাকতুম? তোমার মায়াদিদি গো,—অনেক ছোট তুমি আমার চেয়ে।

আমিও এবার বিস্ময় প্রকাশ করিলাম। বলিলাম, আরে, তুমি? চিনতেই পারিনি. কী হয়ে গেছ। একি চেহারা?

আর চেহারা!—বলিয়া সে একবার পিছন পথের অন্ধকারের দিকে চাহিল, পুনরায় বলিল, চেহারা কি চিরকাল থাকে, ভাই?

তাহার দরিদ্র সজ্জা, শীর্ণপাণ্ডুর মুখ, রোগা একখানা ডান হাত,—অলক্ষ্যে সমস্তটা একবার দেখিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল, একদা আমাদের পাড়ায় ইহার সুশ্রী চেহারার কতখানি প্রসিদ্ধি ছিল। ঠিক মনে পড়ে না, আমি তখন নিতান্তই বালক,—কানাঘুষায় বুঝিতে পারি একজন যুবকের সহিত ইহার সংশ্রব ঘটিয়াছে, তাহাকে পাইবার জন্য এই নারী মাঝে মাঝে পথের বাহিরে যাইত, তারপর একদিন দুইজনে বিবাহ করিল, ঘর-সংসার হইল, একটি সন্তান হইয়া মরিয়া গেল, কালক্রমে পূর্ব-রাগের দুর্নাম ঘুচিল। কিন্তু বড় হইয়া শুনিলাম, যোগমায়ার স্বামী পলাইয়া গেছে, আর যোগমায়া

স্বামীকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য পথে বাহির হইয়াছে। স্বামী বোধ হয় ছিল একটু বিষয়-বিরাগী, সে জন্য শুনিয়াছিলাম যোগমায়া নানা তীর্থস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ এতকাল পরে এই নির্জন রাত্রে তাহার পরণে ময়লা শাড়ী আর কপালে সিন্দুরের দাগ দেখিয়া ভাবিলাম, যাক্, স্বামী তাহার এখনও জীবিত।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া যোগমায়া বলিল, তোমাদের বাড়ীর সব খবর ভালো? মাথায় অনেক বড় হয়েছ চেহারাটাও ভারিক্কে। বিয়ে করেছ, মৃগাঙ্ক?

বলিলাম, হ্যাঁ, দুটি ছেলে মেয়ে রেখে স্ত্রী মারা গেছেন। তারা আমার বোনের কাছে থাকে।

ওমা, এই বয়সে এমন আঘাত? আহা হা, তারপর? কাশী এসেছ কবে?

এই কয়েকদিন।

আছো কোথায়? যাবে কোন্‌দিকে?

বলিলাম, ভেলুপুরা ছেড়ে ওই ইস্কুলটার কাছাকাছি!

যোগমায়া বলিল, ও, বেশ। আমি ঘাটের দিকে প্রায়ই যাই, আবার দেখা হবে। একটু উপকার করো ভাই, আমাকে শিবালয় পৌঁছে দাও। সেই যে বাঁধানো বটগাছটা, ওর কাছেই গলিতে আমি থাকি। ভারি অন্ধকার কিনা—আর ওখানকার ওই কাঠুরে হিন্দুস্থানী বেটারা বড় বেয়াড়া।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তাহার চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, ভূত এবং চোর ছাড়া তাহার এখন আর কোনও ভয় নাই, ইহাতে আমি একটু দুঃখই বোধ করিলাম। তাহার যে-ঐশ্বর্য্য একদা ছিল এবং এখন যাহা আদৌ নাই, ইহার সমস্ত করুণ পরিণতি আমার চক্ষে ভাসিতে লাগিল। ইহার সান্নিধ্যে আমি দারিদ্র্য, উপবাস ও দৈন্যের একটা কণ্ঠরোধী কারুণ্য অনুভব করিতেছিলাম। মনে মনে এই কামনা করিলাম, আর যেন কোনদিন ইহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হয়। দিনের আলোয় লোকজনের মাঝখানে এই নারীর সহিত দেখা হইয়া গেলে বিশ্রী চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া যাইব সন্দেহ নাই।

পথে চলিতে চলিতে যোগমায়া অনেক গল্প করিল, আমি কেবল অল্প কথায় সায় দিতে লাগিলাম। তাহার প্রবাস জীবনের কথা, তীর্থদেবতাদের গল্প, দারিদ্র্যের ইতিহাস, আত্মীয়বিচ্ছেদের কাহিনী। আমি শিশুকালে তাহার কত প্রিয় ছিলাম, তাহার কত চটি ডোবাতে ফেলিয়া দিয়াছি, তেঁতুলতলায় বসিয়া সে আমাকে কত রূপকথা শুনাইয়াছে, তাহার বিবাহের রাত্রে কত কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছি—এই সব কথা সে বলিতে লাগিল। তাহার পর বিশ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, সেদিনের পৃথিবী আর বাঁচিয়া নাই। যোগমায়া বার্দ্ধক্যে আসিয়াছে, আমিও যৌবনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি।

এখন অতীত জীবনের আনন্দ-বেদনার বিবরণ সেদিনকার রূপকথার মতোই শুনায়।

শিবালার কাছাকাছি আসিয়া একটা হিন্দুস্থানী মিঠাইয়ের দোকান দেখিয়া যোগমায়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এখনো খোলা আছে দেখছি।—তারপর ক্ষণকালের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় বলিল, মৃগাঙ্ক, আনা দুই পয়সা দিতে পারো, ভাই?

হাঁ, পারি বৈ কি।—বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইলাম, পরে একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলাম, খুচরো ত নেই, টাকাটা ভাঙাতে হবে।

টাকাটা হাতে লইয়া সে কিছু মিষ্টান্ন ও বাদাম-কড়াই ভাজা কিনিল। দোকানদার টাকা ভাঙাইয়া তাহার হাতে পয়সা ফেরৎ দিল। আঁচলে খাবার বাঁধিয়া যোগমায়া আরো কয়েক পা আসিয়া বলিল, এই যে, এই গলি, ভারি অন্ধকার, হোঁচট লাগে না যেন,—একটু সাবধানে এসো ভাই।

সাবধানেই চলিলাম। কিন্তু আর কতদূর যাইব? হাতড়াইতে হাতড়াইতে আসিয়া বলিলাম, কোন্ বাড়ী তোমার, মায়াদিদি?

চুপ, গলার আওয়াজ দিয়োনা, ব্যাটারা জেগে আছে। এই যে, এসে গেছি। কাশীর গলি কিনা—

গলা নামাইয়া বলিলাম, কা'দের কথা বলছো?

যোগমায়া আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া চাপা গলায় বলিল, ওই যে, ব্যাটারা চোর, নচ্ছার, ছোটলোক —মেয়ে মানুষের সম্ভ্রম বোঝে না—

বলিলাম, তোমার স্বামী কোথায়?

একটি মুহূর্ত যোগমায়া অন্ধকারে আমার প্রতি চাহিল এবং সে একটি মুহূর্তেরই জন্য, তারপর সস্নেহে আমার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, অনেক রাত হয়েছে, তা হোক, যদি এলে এত দূরে তোমার দিদির এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে যাও ভাই। তোমাকে দেখে আজ কী যে আমার আনন্দ।

তাহার কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিক মিনতি ফুটিল তাহাতে আমি আপত্তি করিতে পারিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল। কেন যে একটা অদ্ভুত ত্রাস তাহার মুখে, চোখে, কণ্ঠে ভঙ্গীতে দেখিতেছিলাম তাহা বলিতে পারিনা, দরজার কাছে আসিয়া অতি সাবধানে আর সন্তর্পণে সে দরজা ঠেলিয়া খুলিল। ভিতরে ও বাহিরে কিছু দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু তাহার কথাতেই হউক অথবা মনের বিকারবশতই হউক, কয়েক হাত দূরে আমি যেন দুইটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি সহসা দেখিতে পাইলাম। তাহাদের ভালো করিয়া দেখিবার আগেই যোগমায়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, কোনোদিকে চেয়ো না ভাই, ভেতরে এসো।

আমি ভিতরে ঢুকিতেই সে দরজাটা ভালো করিয়া

বন্ধ করিয়া দিল। এবার আমারও যেন গা ছম ছম করিয়া উঠিল।

অন্ধ পাতালপুরী অথবা কোনও হিমাচ্ছন্ন রহস্যগর্ভ তাহা ঠাহর করিতে পারিলাম না। আলো বায়ুলেশহীন পুরাতন পাথরের জমাট জটলার জটিল গন্ধে আমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। যাহাকে মায়াদিদি বলিয়া এতক্ষণ জানিয়া আসিয়াছি সে যেন এই নিশ্বাসরোধী গুহায় প্রবেশ করিয়া আমার কাছে উপবাসী প্রেতিনীর রূপ ধরিল। দেখিতে দেখিতে নিকটে অথবা দূরে কোথায় যেন তাহার পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেল। কোন দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছি তাহাও বুঝিতে না পারিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আলোর রেখা দেখিতে পাইলাম। আমাকে এখানে রাখিয়া সে উপরে গিয়াছিল, আলোয় দেখিলাম আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া এবং সেই সিঁড়ির ধাপগুলি যেন আমার বুকের কাছে ঠেকিতেছে। আমি উপরে উঠিয়া গেলাম।

এই বাড়ীতে আর কেহ থাকে কিনা বুঝিলাম না। সকল দিকেই কেবল ঘরের পর ঘর কোথাও অবকাশ নাই, একেবারে নিরেট, জমাট। নীচে উপরে এদিকে ওদিকে দ্বিতীয় কোনও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। এখানে অবাধে হত্যা ও রাহাজানি করিলে কেহ কোনও দিন খোঁজ পাইবে না।

আলো দেখাইয়া যোগমায়া আমাকে ঘরের মধ্যে আনিল। ভিতরে মানুষ ছিল। এক জরাশীর্ণা লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা শতচ্ছিন্ন বিছানার ধার হইতে উঠিয়া আমাকে একবার দেখিল।—তুমি চিনতে পারবে না দিদিমা, এ আমার এক ভাই। হঠাৎ পথে দেখা।—যোগমায়া বলিল।

বৃদ্ধা একবার তাহার দিকে, একবার আমার দিকে চাহিল। মনে হইল যোগমায়ার কথা সে বিশ্বাস করে নাই। এবং তারপর একটা অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গী করিয়া সে থপ থপ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

যোগমায়া বলিল, বসো, যাও কোথায়? আরে, না গো না, তা নয়।

কিন্তু বুড়ি বসিল না, স্থবির পাণ্ডুর একরূপ হাসি মুখে টানিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বলিলাম, ব্যাপার কি, মায়াদিদি?

যোগমায়া বলিল, বুড়ির কথা বলছো? ভারি শয়তান। ও বিশ্বাসই করেনি যে, তুমি আমার ভাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। অন্য কথা সহসা মুখে আসিয়াছিল কিন্তু তাহা চাপিয়া গেলাম, বলিলাম, তোমার দিদিমা বুঝি?

রাম বলো। একলা থাকতুম, তাই ওকে ধ'রে এনেছিলুম কালীবাড়ীর ছত্তর থেকে। জাতে কৈবর্ত্ত।

একলা কেন? তোমার স্বামী?

হঠাৎ বিছানাটা যেন নড়িয়া উঠিল। মৃদু কেরো-সিনের আলোয় এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই বিছানার মধ্যে কেহ শুইয়া থাকিতে পারে। এইবার দেখিলাম, পাশা-পাশি তিনটি শিশু ঘুমাইয়া আছে। বুড়ি বোধ করি এতক্ষণ ইহাদেরই পাহারা দিতেছিল। বিছানার একটা ধারে আমি বসিলাম, সেও পাশে বসিয়া পড়িল।

বলিলাম, এরা শুয়ে আছে দেখছি। ক'টি ছেলে-মেয়ে তোমার মায়াদিদি?

যোগমায়া বলিল, একটিও আমার নয়, ভাই।

এরা তবে কা'দের?

সস্নেহে তাহাদের দিকে চাহিয়া যোগমায়া কহিল, ওরা আমারই। আমাকেই মা বলে।

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে কহিল, যাদের কেউ নেই তাদের আমি ফেলবো কোথায় ভাই? ওরাই ত আমার শেষকালের সম্বল।

বলিলাম, জামাইবাবু এখানে চাকরি-বাকরি করেন বুঝি?

যোগমায়া বলিল, তিনি ত এখানে থাকেন না?

তবে?

সে আমি জানিনে, মৃগাঙ্ক।—তাহার গলাটা যেন ধরিয়া আসিল।

বলিলাম, তুমি জানো না তোমার স্বামীর খোঁজ এর মানে কী, মায়াদিদি?

সতেরো বছর তাঁকে আমি দেখিনি—যোগমায়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আশ্চর্য্য মানুষ তিনি, মৃগাঙ্ক।

বলিলাম, এবার আমার বেশ মনে পড়েছে তুমি তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিলে। সেই থেকেই কি তিনি নিরুদ্দেশ?

কেউ বলে তিনি হিমালয়ে, কেউ বলে যবদ্বীপে। আমি কেমন ক'রে জানবো মৃগাঙ্ক, তিনি কোথায়? সবাই বলেছে, সবাই বিশ্বাস করেছে তিনি মারা গেছেন। —মনে হইল অশ্রুতে তাহার গলা বুজিয়া আসিতেছে।

চুপ করিয়া রহিলাম।

যোগমায়া বলিল, সংসারে তার মন ছিল না সে কি আমার দোষ? অথচ—অথচ কি চেষ্টাই না করেছি, কত অপমান আর উৎপীড়ন···কিন্তু কই, পারলুম না ত' তাকে ফিরিয়ে আনতে?

বলিলাম, হয়ত তিনি বেঁচে নেই, মায়াদিদি।

তাহার কপালের সিন্দুরের সহিত তাহার দুইটা শীর্ণ চক্ষুও যেন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, নেই! তুমি জানো না মৃগাঙ্ক, মরতে সে পারে না, আমার অন্তিম দিন পর্য্যন্তও সে মরবে না। তাই কি হয় কখনো? আছে, নিশ্চয়ই আছে, ফিরিয়ে তাকে আনবোই।

ইহার বিশ্বাস একেবারে ইস্পাতে আঁটা, তাহাকে ভাঙিয়া দিব এমন উৎসাহ পাইলাম না। কিন্তু আসল কথাটাও আমার চোখ এড়ায় নাই। টাকা ভাঙাইতে

দিয়াছিলাম, বাকি পয়সা তাহারই কাছে ছিল ; কিন্তু সে আমাকে ফেরৎ দেয় নাই। তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলাম, কিন্তু মায়াদিদি, সংসার ত' তোমাকে ক্ষমা করবে না। ধরো তোমার খরচ-পত্র, এদের মানুষ ক'রে তোলা—

যোগমায়া বলিল, এরা ওই বুড়ির নাতি-নাতনী, কিন্তু কি করবো ভাই, ফেলে দিতে পারিনি, পাখীর মতন খাবার খুঁটে এনে ওদের মুখে দিই। এদের জন্যেই, নৈলে আমি পালিয়ে যেতে পারতুম।

কিন্তু এদের জন্যে তুমি এত সইবে কেন, মায়াদিদি ?

যোগমায়া বাহিরের দিকে চাহিল। বলিল, ওরা শিশু, তবু ত ওরাই আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, মৃগাঙ্ক।

তাহার দুই চক্ষু জলে ভরোভরো দেখিয়া আমি আর উহার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। বিশ বৎসর পরে মাত্র এক ঘণ্টা আগে যাহাকে দেখিয়াছি তাহার মনের অলিগলির সন্ধান আমি পাইব কেমন করিয়া ? যাহার জন্য কিছু করিবার উৎসাহ ও অভিরুচি আমার নাই, এখনই বিদায় লইয়া যাহাকে হয়ত সারাজীবনেও আর কোনদিন দেখিব না, তাহার জীবনের সমস্যা আলোচনা করিয়া আত্মীয়তা পাতাইতেই বা যাইব কেন ?

রাত গভীর হইয়াছে। শেষকালে কিছু একটা বলিয়া বিদায় লইতে হইবে, কিন্তু কি বলিয়া তাহার নিকট ছুটি

লইব তাহাই ভাবিতেছিলাম। এমন সময় সে নিজেই কথা বলিল, আচ্ছা, মৃগাঙ্ক!

মুখ তুলিলাম।

সে কহিল, তুমি কি বলতে পারো তিনি ফিরবেন?

বলা বড় কঠিন, মায়াদিদি।

ফিরবেন—যোগমায়া বলিল, তুমি যদি একটি জিনিস আমাকে দিতে পারো ভাই।

বলিলাম, কি বলো ত?

আরো কাছে আসিয়া চুপি চুপি যোগমায়া বলিল, সত্যিই বলচি তোমাকে, অনেকেই আমাকে দিয়েছে। কিন্তু মনে হয় সে সব খাঁটি জিনিষ নয়। এই ত্যাখো, অনেকগুলো মাদুলী পরেছি হাতে। কিন্তু—আচ্ছা, সেই যে একরকম বন-মানুষের হাড় পাওয়া যায়, জানো ত? ধরো যদি আমি সেটা কাছে রাখি—কেবল তোমাকেই বলছি চুপি চুপি—

বলিলাম, বন-মানুষের হাড়? কী হবে?

যোগমায়া এবার একটু হাসিল। বলিল, হ্যাঁ, লোকে বলে তাই। পারো দিতে? মানে, যা চাই তাই নাকি পাওয়া যায়।

এই আজগুবী কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু ইহাকে আঘাত দিতে আমার মন উঠিল না, কেবল সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, পাওয়া কঠিন, তবে চেষ্টা করতে পারি।

যদি পাও কোনদিন তা'হলে তোমার দিদিকে—কে ? কে ওখানে ?

তাহার গলা শুনিয়া সভয়ে আমি পিছন ফিরিয়া চাহিলাম। কিন্তু যেদৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। এই বন্ধ প্রেতপুরীর কোনো ফাঁকে দুইটা দীর্ঘাকার লোক কখন্ ঢুকিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে !

যোগমায়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল। বলিল, দেখলে মৃগাঙ্ক, ওরা ওই দক্ষিণ দিককার পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছে। ডাকাত, খুনে, ছোটলোক—

আমিও সাহস করিয়া উঠিলাম, কিন্তু যাহাদের ডাকাত আর ছোটলোক বলা হইল তাহারা এক পাও পিছাইল না, বরং আরো দুই পা অগ্রসর হইয়া হিন্দিভাষায় বলিল, টাকা ফিরিয়ে দাও বলছি।

টাকা ? টাকা তোমাদের নিয়েছি আমি ?—এই বলিয়া যোগমায়া বাহির হইয়া আসিল।

আমিও বাহির হইলাম। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল, এগিয়ো না ভাই, দেখছো না ঘর পর্য্যন্ত এসেছে ? ওই ত্যাখো নেশা ক'রে টলছে—

বলিলাম, কেন ওদের এই আস্পর্দ্ধা ?

তুমি ভাই যেয়ো না, দরকার কি ? হয়ত মেরেই বসবে, ওদের কিছু জ্ঞানগম্যি আছে ? দেখো, দেখো

আবার হাসছে ফিক-ফিক ক'রে। আ মরণ, লজ্জা নেই এতটুকু?

লোক দুইটা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই আমার সেই ছায়ামূর্ত্তি দুইটার কথা মনে পড়িয়া গেল। কাছে আসিয়া একজন প্রশ্ন করিল, তুম কৌন্ হ?

ঝঙ্কার দিয়া যোগমায়া বলিল, যেই হোক, তোমার কি? ও আমার ছোট ভাই—খবরদার ব'লে দিচ্ছি—

উহাদের একজনকে যেন বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইল। আমি একবার তাহাদের দিকে, একবার যোগমায়ার দিকে চাহিলাম। মনে হইল ইহারা নবাগত নহে, নিতান্ত ডাকাতও নহে। কিন্তু যোগমায়া চেঁচাইতেই লাগিল, ওই বুড়ি—বুড়িই যত নষ্টের গোড়া। টাকার কথাটা কেবল ছুতো, বুঝলে মৃগাঙ্ক? ওই, আবার দাঁড়িয়ে রইলে যে? মেয়েমানুষের মান রাখতে জানো না জানোয়ার কোথাকার। যাও, বেরোও, দূর হও এখান থেকে। কী দেখছ ওকে? ও আমার ভাই। দেখছ মৃগাঙ্ক, কী কুৎসিত সন্দেহ ওদের মুখে? মা বোন নেই তোমাদের ঘরে? বেরোও, বেরোও বলছি—

এই বলিয়া সে লোক দুইটাকে তাড়া করিয়া অন্যদিকে লইয়া গেল। কোন্ পথ দিয়া তাহারা ভিতরে ঢুকিল, কোথা দিয়াই বা তাহারা বিতাড়িত হইল, তাহা অন্ধকারে আর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যে-অপমান আমাকে করিয়া গেল, যে-শ্রদ্ধা আমার ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল

তাহা কেবল অধীর অশ্রু-বিন্দুতে পরিণত হইয়া আমার দুই চোখ ভরিয়া আসিল। ইহার ভিতরে প্রশ্ন নাই, রহস্য ভেদ নাই, শুধু কেবল নিরুপায় মনুষ্যত্বের অসম্মানে আজিকার এই নির্জন অন্ধরাত্রি আকণ্ঠ অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার বুকের ভিতরে একবার অব্যক্ত আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

মিনিট দুই পরে যোগমায়া ফিরিয়া আসিল। আমি নতমস্তকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম কিন্তু তবুও স্পষ্ট অনুভব করিলাম অশ্রুর ধারা তাহার দুই জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য-পাণ্ডুর গাল বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে। সে শান্ত কণ্ঠে কহিল, নিত্যদিন এই যন্ত্রণা···তবু ভাই মনে করেছিলুম আজকের রাতটা অন্তত তোমার সঙ্গে ফিরে যাবো সেই অতীত জীবনে—সেই নির্ম্মল আনন্দের জগতে—

ঘরের বিছানায় একটি শিশু জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতেছিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া যোগমায়া পুনরায় কহিল, চলো ভাই তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। অনেকটা পথ যেতে হবে—দিদিকে তোমার মনে থাকবে ত?

ঘাড় নাড়িলাম, কথা কহিতে পারিলাম না। কেরোসিনের কুপিটা হাতে লইয়া সে অগ্রসর হইল, আমিও জামার হাতায় চোখ মুছিয়া অতি সন্তর্পণে সিঁড়ির দেয়াল দুই হাতে ধরিয়া-ধরিয়া নামিয়া আসিলাম। সে নীচে আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিয়া পাশে সরিয়া দাড়াইল।

তাহার হাতের আলোটার ক্ষীণরশ্মি ধরিয়া পথে নামিয়া আসিলাম কিন্তু কিছু দূর গিয়া সেই বাঁধানো বটগাছের বাঁকে ফিরিয়া ওই দিকেই আমার দৃষ্টিটা পুনরায় ফিরিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া লক্ষ্য করিলাম, সেই দুইটা লোক ওই আলোটার নির্দেশ ধরিয়া পুনরায় যোগমায়ার বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। একটি রাত্রির জন্যও নিষ্কৃতি তাহারা দিবে না, পাওনা আদায় করিবেই।

এতক্ষণ জানিতে পারি নাই যে, ঘৃণায় আমার আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছিল; এখন অনুভব করিলাম করুণায় ও স্নেহে আমার সকল হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। অবশ শিথিল দুই পা টানিতে টানিতে আমি জনহীন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।